বিভিন্ন বাতিল মতবাদ ও তার আগ্রাসন

প্রাককথন

হক-বাতিলের লড়াই চিরন্তন। ইসলামের সাথে বিভিন্ন কাফির গোষ্ঠীর বিশ্বাসগত, বিধানগত, নীতিগত দিক থেকে প্রবল যুদ্ধ চলে আসছে মানব ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই। মানবতার কল্যাণ, সুবিমল আলোকধারা, শান্তির ফোয়ারা বহনকারী ইসলামের সাথে বিভিন্ন গোঁড়া, বিদ্বেষপরায়ণ ও কাফিরগোষ্ঠীর সাথে সর্বদাই এ সংঘাত চলে আসছে। এ এক তীব্র চলমান সংঘাত, যা কখনো থেমে যাবার নয়।

উত্তম যুক্তি ও বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও শালীনতার প্রতি অবজ্ঞাকারী এসব কট্টরবাদী কাফিরগোষ্ঠীর সাথে ইসলামের সংঘাত চিরকালের জন্য অবধারিত। কেননা, তাদের কর্মপন্থা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর ভিত্তি করে নয়; বরং তাদের কার্যক্রম বিকৃতি ও অসত্যের ওপর দণ্ডায়মান। নিজেদের মজ্জাগত মন্দ স্বভাব ও উন্মাদনাপূর্ণ কট্টরপন্থা এক সত্য ও সুন্দর ধর্মের বিপক্ষে তাদের সর্বদা উসকানি দিয়েই চলছে।

ইসলামের এ যুদ্ধ সর্বদা চলমান ছিল, আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। অনেক মানুষ আছে, যাদের একমাত্র কামনা-বাসনা হলো, দুনিয়ার বুকে ফাসাদ ছড়ানো এবং অসত্যকে শক্তপোক্ত করা। যতদিন এ পৃথিবীতে মানবরূপী এমন শয়তানগোষ্ঠী অবস্থান করবে, ততদিন এ লড়াই চলমান থাকবে। ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িত এসব ভ্রান্তধর্ম ও জীবনব্যবস্থার ফেরিওয়ালা কুফরিব্যবস্থার সংখ্যা একেবারে কম নয়। শুধু আমাদের বাংলাদেশের হিসাব করলেই এর সংখ্যা সহস্য ছাড়িয়ে যাবে। সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গেলেও বিশাল কলেবরের আলাদা একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাই আমরা এ অধ্যায়ে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়ানক ও প্রভাব বিস্তারকারী প্রসিদ্ধ কিছু মতবাদ নিয়ে আলোচান করব। শেষে ক্রুসেড ও উপনিবেশবাদ নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পূজনবাদ

প্রত্যেক এমন কর্ম, যাতে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো বস্তু বা অন্য কোনো সত্তাকে অংশীদার করা হয়, অথবা আল্লাহ তাআলা ব্যতিরেকে অন্য কারও ইবাদত করা হয়, এমন কর্মকে পূজা বলে।

পূজার বিভিন্ন ধরন ও রকমভেদ আছে। এককেবার এককেরূপে একে দেখা যায়। যেমন কিছু মানুষ রাতের পূজা করে, কেউ দিনের পূজা করে, কেউ চাঁদ, তারা, নদী, পাহাড়, সাগর, মূর্তি ইত্যাদির মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের পূজা করে। কিছু মানুষ তো রাজা-বাদশাহকে নিজের মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে। উদাহরণত মিশর জাতি ফিরাউন বাদশাহকে, আরেক জাতি নমরুদকে, আর কতক মানুষ গাছপালা কিংবা পাথরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করে তাদের পূজা করত। এ সকল বস্তু বা সত্তার প্রতি তারা ছিল পূর্ণ আনুগত্যশীল।

পূজা বলতে সাধারণত মূর্তিপূজা মনে করা হয় এবং ধারণা করা হয় এটাই শুধু শিরক। এটা করলেই কেবল পূজা হয়। অথচ পূজার রকমভেদে এমনও রূপ আছে, যা বর্তমানকালে মানুষের নিকট স্পষ্ট নয়। এমনই কয়েক প্রকার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. জাতীয়তাবাদ

দেশ, ভাষা, বংশ, ভৌগোলিক সীমারেখা প্রভৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তা দাঁড় করিয়ে শুধু এর জন্যই জান-জীবন কুরবান করা এবং এর জন্যই লড়াই করার নাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের অনেক শ্রেণি রয়েছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করছি।

ক. দেশপ্রেম

ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবধর্ম। কারও স্বভাবে দেশপ্রেম থাকা কোনো সমস্যার নয়। কেননা, যে ব্যক্তিই সুস্থ-স্বাভাবিক হবে, তার ভেতরে দেশের জন্য স্বভাবগতভাবেই প্রেম-ভালোবাসা থাকবেই। যখন দেশ থেকে দূরে কোথাও সে যায়, তখন তার মন দেশের জন্য কাঁদবেই। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে মদিনায় তাঁর সাহাবি ও পরিবারের মাঝে ছিলেন। তা সত্ত্বেও নিজ জন্মভূমির জন্য তাঁর মনের টান ও ভালোবাসা মুছে যায়নি। একবার জনৈক মুহাজির সাহাবি মক্কাসংক্রান্ত একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতায় মক্কার আলোচনা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে।

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার টান বোঝা যায় হাদিসের আরেকটি বর্ণনায়। মক্কার অত্যাচারী কাফিরদের কারণে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে বের হয়ে এলেন। হিজরত করে ইয়াসরিব অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন। বিদায় বেলায় তিনি প্রিয় শহর মক্কার প্রতি সম্বোধন করে বললেন :

وَاللهِ إِنَّكِ، لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ، وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ

> ‘আল্লাহর শপথ! তুমিই হলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ভূমি। আমার নিকট আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর শপথ! যদি আমাকে বের করে দেওয়া না হতো, তবে আমি কখনো তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না।’[১]

দেশের প্রতি ভালোবাসা স্বভাবজাত অনুভূতি, যা মানুষের হৃদয়ে তৎপ্রতি টান সৃষ্টি করে। কিন্তু দেশাত্মবোধ থেকে উৎসারিত মূল্যবোধ যখন দ্বীনের স্থান দখল করে নেয়, তখন ইসলাম এমন দেশপ্রেমকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া গণ্য করে। এটি আল্লাহর নির্ধারিত নীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নামান্তর। যদি বিষয়টি এরকমই হয়ে থাকে, তবে ইসলামি শরিয়া আপনাকে বলবে—থামো, এ দেশপ্রেম নয়; বরং এ হলো দেশপূজা।

মূলত দেশপ্রেম কোনো নীতি নয়, কোনো দর্শন বা কোনো জীবনব্যবস্থা নয়; বরং তা একটা অনুভূতি মাত্র, যা অন্তর থেকে নির্গত হয়, যার ভিত্তি হলো স্বভাবজাত ভালোবাসা। আর ভালোবাসা এমন এক আবেগ, যার ওপর ভিত্তি করে দেশপ্রেম কোনো জীবনব্যবস্থা বা আদর্শ হতে পারে না।

---

১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২/১০৩৭, হা. নং ৩১০৮ (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) - হাদিসটি সহিহ।

যদি দেশপ্রেমকে কোনো আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার কেউ ইচ্ছাও করে, তবে তা কীভাবে আকিদা, সভ্যতা, মানহাজ; সর্বোপরি একটি জীবনব্যবস্থা হবে? কীভাবে জীবনের প্রতিটি স্তরের সকল সমস্যার সমাধান করবে? কীভাবে আত্মিক ও শারীরিক সমস্যার সমাধান দেবে? কীভাবে পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাধান পেশ করবে? কীভাবে মুআমালার বিষয়াবলি, যথা : বেচাকেনা, ঋণ দেওয়া-নেওয়াসহ বিভিন্ন অধিকার সুনিশ্চিত করবে? কীভাবে দণ্ডবিধি, যথা : হদ, কিসাস, তাজিরের ব্যাখ্যা করবে? কীভাবে ব্যক্তিক বিষয়াবলি, যথা : বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, উত্তরাধিকার আইনের সমাধান করবে? কীভাবে বিচার ও শাসনবিষয়ক, যথা : বাইআত, আনুগত্য, শুরা, যুদ্ধ, বিচার, সাক্ষ্য, শপথসহ মানুষের জীবনের নানা দিকের নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা দেবে? মূলত দেশাত্মবোধের মাঝে এর কোনো সমাধান নেই। কেননা, তা শুধু কিছু আবেগ ও ভালোবাসার নাম, কোনো আদর্শের নাম নয়।

নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত মুসলিম তার দেশকে অন্যদের চাইতে উন্নতভাবে দেখে, দেশের সেবা করে এবং দেশের প্রতিরক্ষা করে। কিন্তু কোনো মুসলিমের জন্য মোটেও উচিত নয় যে, দেশপ্রেমকে ইসলামের মর্যাদায় সমুন্নত করা। কেননা, দেশপ্রেম না কোনো আদর্শ হতে পারে আর না হতে পারে কোনো জীবনব্যবস্থা। অন্যদিকে ইসলাম হলো মহান প্রভুর দানকৃত এমন একটি নির্দেশিকা, যা সকল যুগের, সকল স্থানের, সকল মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা।

তাই দেশাত্মবোধ থেকে উৎসারিত কোনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকা, তা ধরে রাখা এবং ইসলামের স্থানে তাকে সমাসীন করাকে আমরা দেশপূজা ব্যতীত অন্য কোনো নাম দিতে পারি না। একজন মুসলিমের কাছে দেশের আগে ইমান, দেশপ্রেমের পূর্বে ইসলামের স্বার্থ অগ্রগণ্য। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে স্বভাবজাত দেশপ্রেমে ইসলামের কোনো বাধা নেই। কিন্তু যদি কোথাও ইসলামের স্বার্থের সাথে দেশের স্বার্থের সংঘাত হয়, তাহলে একজন মুমিন অবশ্যই ইসলামের স্বার্থকে অগ্রগণ্য রাখবে, দেশের স্বার্থকে পিছে রাখবে। মোটকথা, নিজ জন্মভূমি বা দেশের প্রতি টান-ভালোবাসা সত্তাগতভাবে জায়িজ, কিন্তু যখন তা শরিয়তের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে, ইসলামের সাথে কোথাও সাংঘর্ষিক হবে, তখন জন্মভূমি বা দেশকে প্রাধান্য দিলে তা আর দেশপ্রেম বলে বিবেচিত হয় না; বরং তার নাম হয়ে যায় দেশপূজা। আমাদের দেশের অনেক মুসলিম এ দেশপ্রেমের নামে মূলত দেশপূজা করে যাচ্ছে; অথচ তাদের এ বিষয়ে কোনো উপলব্ধিও নেই।

খ. ভাষাপ্রীতি

ভাষাপ্রীতিকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে না। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মভূমির প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা থাকে, দেশের প্রতি থাকে আলাদা এক ধরনের টান। তেমনই ভাষা হলো বিভিন্ন সমাজের মাঝে জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত একটি বিষয়। এটি মানুষের অভ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন সমাজে যার রূপ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ ভাষা তাদের মনের অনুভূতি প্রকাশের একটি মাধ্যম। তাই নিজ মাতৃভাষার প্রতি টান থাকাটা কিছুতেই দোষণীয় কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে আরবি ভাষা কিছুটা ভিন্ন। কারণ, আরবি ভাষা সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ একটি ভাষা। ইসলাম আরবি ভাষা শিখতে, এ ভাষার শব্দাবলি আয়ত্তে আনতে ও এর মিষ্টতা অনুভব করতে উৎসাহিত করে। কেননা, আরবি ভাষা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার মাধ্যম। সম্মানিত এ কিতাবের মর্যাদা, গুরুত্ব ও আলৌকিকত্ব বোঝার সরাসরি পথ। তা ছাড়া আরবি ভাষা মুসলমানদের ভালোবাসার ভাষা ও ধর্মীয় একটি প্রতীক।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

فإنَّ اللسان العربي شعار الإسلام و أهله

'নিশ্চয়ই আরবি ভাষা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের ঐতিহ্য।'[২]

তবে কোনো ভাষার প্রেম যদি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরায়, ইসলামের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে—সর্বোপরি ভাষার জন্য রক্তপাত হয়, তাহলে তা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। নিজ ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা সবারই আছে, কিন্তু কারও ওপর নিজের ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া বা ভাষার জন্য স্বশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়া সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি। ইসলামি শরিয়ত এমন ভাষাপ্রেমকে কখনো সমর্থন করে না।

২. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম : ১/৫১৯ (দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত)।

২. রক্তসম্পর্ক ও বংশপরম্পরা

মর্যাদার মাপকাঠিতে ইসলামে রক্তসম্পর্ক, বংশপরম্পরা ইত্যাদির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। ইসলাম এগুলোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করে না; বরং ইসলাম মানুষকে পরিমাপ করে ইমান, তাকওয়া ও ইলমের মানদণ্ড দ্বারা। কেননা, যে ব্যক্তি মুমিন-মুত্তাকি-আলিম হবে, সে অন্যদের থেকে উত্তম ও সম্মানিত হবে। তার শান-শওকত, বংশমর্যাদা, অঢেল সম্পদ থাকুক বা না থাকুক; মুসলিম হিসাবে সে সম্মানিত। তাকে পরিমাপ করা হবে একমাত্র ইমান, তাকওয়া ও ইলমের মানদণ্ডে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যাদের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন, যা কিছু তোমরা করো।'[৩]

ইসলামে রক্তসম্পর্ক, বংশ ইত্যাদির বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। যেমন জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের দিন আমাদের উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা প্রদান করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

'হে লোকসকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। সাবধান! অনারবের ওপর কোনো আরবের মর্যাদা নেই এবং আরবের ওপর কোনো অনারবের মর্যাদা নেই। অনুরূপ কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের ফজিলত নেই এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ফজিলত নেই। মর্যাদার মাপকাঠি হলো, একমাত্র তাকওয়া।'[৪]

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

'যে আমলে কমতি করল, আখিরাতে বংশমর্যাদা তাকে কোনো উপকার করবে না।'[৫]

জাতীয়তাবাদ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি ও জাতির মাঝে আবদ্ধ করে ফেলে। অন্যদিকে ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে শামিল করে নেয়, যার মাঝে সকল সমাজ ও জাতি একত্রিত থাকে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ইসলামের অধীনে এক ও অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। জাতীয়তাবাদ মানুষকে একটি ভূমি, একটি বর্ণ, একটি ইতিহাসের মাঝে আবদ্ধ করে ফেলে। অপরদিকে ইসলাম মানুষকে সমগ্র পৃথিবী, প্রত্যেকটি বর্ণ ও বিস্তৃত ইতিহাসের অধিকারী করে। কোনো ধরনের ভেদাভেদ ব্যতিরেকে সকলকে এক উম্মাহর অধীন করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[৬]

ইসলামের সাথে জাতীয়তা ব্যাপকভাবে সাংঘর্ষিক। জাতীয়তা নিয়ে পড়ে থাকা অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। ইসলামে এটি মূর্তিপূজার সমান অপরাধ। জাতীয়তাকে লালন করার অর্থ হলো আল্লাহকে ছেড়ে জাতি, ভাষা ও বংশকে পূজা করা।

---

৩. সুরা আল-মুজাদালা : ১১
৪. মুসনাদু আহমাদ : ৩৮/৪৭৪, হা. নং ২৩৪৮৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
৫. মুসনাদু আহমাদ : ১২/৩৯৩, হা. নং ৭৪২৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
৬. সুরা সাবা : ২৮

কওমচেতনা বা গোত্রভিত্তিক জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হলো আবেগের ওপর, যা আমরা দেশাত্মবোধ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এটি শুধুই আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনব্যবস্থা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এটা এমন কোনো আকিদা-বিশ্বাস বা দর্শন হতে পারে না, যা মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য সত্যিকারভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি প্রণয়ন করবে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের সুচারু সমাধান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি জিজ্ঞাসার স্পষ্ট সমাধান করে দিয়েছে।

ইসলামের সাথে জাতীয়তার আরেকটি বিরোধপূর্ণ স্থান বুঝার জন্য আমরা আরব চেতনাকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি। আরবরা অনারব কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, কোনো মুসলিমের প্রতি এ কারণে এতটুকু গুরুত্ব দেয় না যে, সে মুসলিম। আরব-চেতনাধারীদের বিশ্বাস হলো, সে আরব নয়, তাই সে সম্মানের উপযুক্ত নয়। তাদের নিকট মানদণ্ড হলো, আরব হওয়া। তাদের নিকট কোনো অনারব মুসলিমের মর্যাদা নেই। সে-ও তাদের নিকট বিদেশী ও অপরিচিত। কিন্তু এ ভাব ও ধরন ইসলামের চোখে চরম ন্যাক্কারজনক। কেননা, ইসলাম এটা দেখে না যে, কে আরব আর কে অনারব; বরং এখানে মর্যাদা পরিমাপের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া।

ইসলামের বিধান তো হলো, মুসলিমগণ ভাষা, বর্ণ, বংশ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে সকলেই এক ও অভিন্ন। ইসলামি আকিদা সকলের মাঝে ভালোবাসা স্থাপনকারী। তারা একটি উম্মাহ, একটি জাতি। যেখানে আরব, অনারব, কুর্দি, হিন্দুস্তানি, বাংলাদেশি, তুর্কি, হাবশি সকলে এক সমান, এক মর্যাদার। যেমন আম্মার আরাবি রা., সুহাইব রুমি রা., বিলাল হাবশি রা., সালমান ফারসি রা., সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কুর্দি রহ. প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন মুসলিমদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্তর্গত। যদিও তাঁদের বংশ ভিন্ন ছিল এবং তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন জাতির।

মুসলিমদের মাঝে যারা ইলমের ময়দানে অকুণ্ঠ খিদমত পেশ করেছেন, তাদের অধিকাংশই আরব ছিলেন না। উদাহরণত ইমামুল মুফাসসিরিন মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারি রহ. আরব ছিলেন না। ইমামুল মুহাদ্দিসিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ. আরব ছিলেন না। ইমামুল ফুকাহা আবু হানিফা নুমান রহ. আরব ছিলেন না।

এরকম হাজারো উদাহরণ আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইসলামি আকিদা, ইসলামি শরিয়ত ও ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে একমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ইসলামের কারণেই শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, আরব বা অনারব হওয়ার ভিত্তিতে নয়। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, আরব হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের কোনো মানদণ্ড নয়; বরং অনারব হয়েও ইলমের আকাশে, কিতালের ময়দানে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদ দেশাত্মবোধের রক্ষাকবচ। উভয়টির উৎপত্তিস্থল হলো আবেগ। এগুলো মানবজীবনের সকল জিজ্ঞাসার সমাধান ও সকল স্তরের করণীয়বিশিষ্ট কোনো আদর্শ বা জীবনব্যবস্থা নয়। ইসলামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এগুলোকে আপন করে নেওয়াই হলো, এগুলোর পূজা করা, যা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে জাতীয়তাপূজা ও দেশপূজা গ্রহণ করার নামান্তর।

৩. হিন্দুধর্ম

এটা ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ একটি গোষ্ঠীর ধর্ম। এটা এমন এক ধর্ম, যা পূজা-অর্চনা ও তার বিভিন্ন রূপকে একত্রিত করেছে। যে ধর্মে যে কেউ যে কোনো খারাপ কাজই করুক, ধোঁকাবাজি করুক অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করুক, সে কৃতকর্মের ফলভোগ থেকে মুক্ত। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, পৌরাণিক কল্পকাহিনী ও বিভিন্ন কুধারণার জপমালা।[৭]

হিন্দু ধর্মে এ পূজা করার আধিক্য অনেক বেশি। ভারতে পূজনের এমন অনেক রূপেরই দেখা পাওয়া যায়, যা কল্পনারও বাইরে। তারা পাহাড়, নদী, তারা-নক্ষত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম, নর-নারীর যৌনসংক্রান্ত বিভিন্ন বস্তুকে পূজা দেয়। তারা বিভিন্ন রকমের পশুকে পূজা করে। তন্মধ্যে তাদের নিকট অধিক সম্মানিত হলো গরু। বর্তমানে এটি এমন এক পবিত্র বস্তুর নাম হয়ে গেছে যে, কোনো রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাকে ছোঁয়া যাবে না অথবা জবাই কিংবা অন্য কিছু করার দ্বারা তাকে কোনো প্রকারের কষ্ট দেওয়া যাবে না।[৮]

৭. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল : ৩/৯৫ (মুআসসাসাতুল হালবি)
৮. মা-জা খসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন : পৃ. নং ৪৯ (মাকতাবাতুল ইমান, মানসুরা, মিশর)

হিন্দু জাতি প্রতিবেশী মুসলিমদের প্রতি সব সময় শত্রুতা পোষণ করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত তারা সে শত্রুতা জিইয়ে রাখে। ব্যষ্টিক, সামাজিক, রীতিগতভাবে প্রতিটি স্তরে তারা মুসলিমদের ঘৃণা করে। মুসলিমরা এ সকল পূজক হিন্দুদের হাতে চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তারা মুসলিমদের নানা ধরনের কষ্ট ও শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। তারা লাখ লাখ মুসলিম হত্যা করেছে। অগণিত মুসলিম ললনাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করেছে। সে হিংস্রতা ও বর্বরতার ভাষা কী হতে পারে, যা ভারতের মজলুম মুসলিমদের ওপর চলছে!?

মুসলিমদের গরু জবাই ও তা ভক্ষণের কারণে হিন্দুরা তাদের গৃহীত প্রভু গরুর অসম্মান ও মর্যাদাহানি মনে করায় তাদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। যদিও ভারতই হলো গরুর গোশত রপ্তানিতে বিশ্বতালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী। তবুও যখন মুসলিমরা গরু জবাই করে, তখন তাদের মনের ভক্তি জেগে ওঠে! নিজেরা নিজেদের দেবতাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বহির্বিশ্বে ঠিকই রপ্তানি করতে পারে। কিন্তু মুসলিমরা বাজার থেকে গোশত কিনেও খেতে পারবে না। এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি পূর্ণ হয়েছিল, তবুও হিন্দুরা তাদের হিংসা ও শত্রুতা ছাড়ল না। এমনকি পরবর্তীকালে বিষয়টি রক্তক্ষয়ী ও ভয়ংকর যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল। একদিকে গোঁড়া-কট্টর-পূজক হিন্দুশ্রেণি অন্যদিকে পাকিস্তানের ধৈর্যশীল মুসলিম জাতি—যারা অনেক আগ থেকে হিন্দুদের শত্রুতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। শিকার হয়ে আসছে এমন হত্যাযজ্ঞের, যার সাথে তুলনা হতে পারে রক্তক্ষয়ী ক্রুসেডের, বা তাতারিদের হিংস্র হত্যাকর্মের। এখনও কাশ্মীরে মুসলিমরা মূর্তিপূজক হিন্দুদের শত্রুতার মুখে প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে।

মুসলিমদের প্রতি এ শত্রুতার ফলে ভারত পাকিস্তানের ওপর সে জুলমপূর্ণ যুদ্ধকে চাপিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় এবং পাকিস্তান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পশ্চিম পাকিস্তান ও অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নাম পাল্টে রাখা হলো বাংলাদেশ। এ যেন কাফিরদের Divide & Rule মূলনীতির আরেকটি নমুনা। কাফিররা অনেক আগ থেকেই মুসলিমদের বিভক্ত করে তাদের শোষণ করার জন্য এ মূলনীতি প্রয়োগ করে আসছে। ভারতের এ কর্ম ছাড়াও তাদের আরও অনেক ষড়যন্ত্রই রয়েছে আড়ালে। এ যুদ্ধে তাদের সহযোগী হিসাবে ছিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়া, যে রাষ্ট্র মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা কী?

ছোট্ট একটি প্রশ্ন, কিন্তু তার জবাব অনেক দীর্ঘ। ইংরেজিতে একে Secularism, আরবিতে علماني এবং বাংলায় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বলা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা কী বা কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের বেশি কষ্ট করতে হবে না। কারণ, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' মতবাদের জন্মস্থান পাশ্চাত্যের দেশসমূহের লিখিত অভিধানগুলো আমাদের সে অর্থ অনুসন্ধানের কষ্টকে লাঘব করে দিয়েছে অনেকটাই। ইংরেজি অভিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে :

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।

২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয় এমন।

৩. দুনিয়াবিরাগী নয়, সংসারবিরাগী নয়।[৯]

একই অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় এসেছে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন একটি দর্শন, যা চরিত্র, নীতি, নৈতিকতা ও শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ধর্মহীনতার ওপর গড়ে উঠবে।

Encyclopædia Britannica-তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য হলো, মানুষদের আখিরাত থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ামুখী করা।

Encyclopædia Britannica-তে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনার অধীনে الإلحاد তথা নাস্তিকতার আলোচনা এসেছে। তাতে নাস্তিকতাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা (إِلْحَادٌ نَظَرِيٌّ)

২. ব্যবহারিক নাস্তিকতা (إِلْحَادٌ عَمَلِيٌّ)

এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যবহারিক নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১০]

উক্ত বর্ণনা দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করে :

প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরি মতবাদ, যার লক্ষ্য হলো, দুনিয়াকে দ্বীনি প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কাজ হচ্ছে, পার্থিব জগতের সকল বিষয়কে দ্বীনি বিধি-নিষেধ থেকে দূরে রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চারিত্রিকসহ সকল ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন কতক কুচক্রী মানুষদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য বলে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্দেশ্য হলো, 'পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ওপর উৎসাহিত করা ও তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা'। এ দাবির অসারতা উল্লিখিত অর্থ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' এর উৎপত্তি স্থল থেকে, যে পরিবেশে তার উৎপত্তি ও বেড়ে উঠা হয়েছে—তার থেকে।

তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে যদি বলা হয়, এটি হলো ধর্মহীনতা, তাহলেই কেবল তার প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রকাশ পাবে।[১১]

---

৯. দুনিয়াবিমুখিতা বা সংসারবিরাগিতা খ্রিষ্টানদের নিকট একটি ইবাদত, যা তাদেরই আবিষ্কৃত একটি পন্থা। সুতরাং যখন তারা বলে, 'সে সংসারবিরাগী নয়'-এর দ্বারা বোঝাতে চায় যে, সে ইবাদতকারী নয়। এটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংজ্ঞার কাছাকাছি। যেমন মুসলিমরা মনে করে যে, সংসারবিরাগিতা হলো বিদআত, এ ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের মত ভিন্ন। তারা এটাকে বিদআত মনে করে না; বরং তারা এটাকে মনে করে সত্যিকার দ্বীন। তাই যখন তাদের কেউ বলবে যে, 'অমুক লোক সংসারবিরাগী নয়' তখন সে এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেয়নি যে, সে বিদআত করে না; বরং তার উদ্দেশ্য থাকে, লোকটি ইবাদতের ধারে কাছেও নেই।

১০. নাস্তিকতার ওপর ইংরেজি অভিধান ও বিশ্বকোষের যে বিশ্লেষণ আমরা উল্লেখ করলাম, তা ড. মুহাম্মাদ জাইন আল-হাদি রচিত نشأة العلمانية বা 'সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১১. মুহাম্মাদ বিন শাকির শরিফ কৃত আল-আলমানিয়্যাতু ও সামারাতুহাল খাবিসা : পৃষ্ঠা নং ৪-৫

ধর্মনিরপেক্ষতার রূপসমূহ

ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি রূপ রয়েছে, যার একটি অপরটি থেকে নিকৃষ্টতর।[১২]

প্রথম রূপ : সরাসরি নাস্তিকতা

এ প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ও রূপদাতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এসংক্রান্ত কোনো কিছুকে এ ব্যবস্থা স্বীকার করে না; বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ইমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে তারা শত্রুতা রাখে এবং যুদ্ধ করে। তাদের কুফরি চিহ্নিত করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ।

আলহামদুলিল্লাহ, তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, সে ব্যতীত অন্য কেউ তাদের দিকে ধাবিত হয় না। এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা সাধারণ মুসলিমদের জন্য কম বিপজ্জনক। কারণ, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম হয় না, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে দ্রোহ, মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া অথবা জেলে বন্দী করা কিংবা নির্যাতন ও হত্যা করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় রূপ : পরোক্ষ নাস্তিকতা

এ প্রকার নাস্তিকতা প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার ওপর ইমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের নিকট দ্বীন হলো নির্জীব এক বস্তুর নাম। তাদের আহ্বান পার্থিব সকল বিষয়কে দ্বীন থেকে পৃথক করা। সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়া ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা অধিক বিপজ্জনক। কারণ, তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বা তার দ্বীনের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট অস্পষ্ট থাকে। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফরি বলে মনে করে না। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমই তাদের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জানে না ।

অনেকের নিকট দ্বীনের সাথে পরোক্ষ নাস্তিকতার সাংঘর্ষিকতা স্পষ্ট নয়। কারণ, তাদের নিকট দ্বীনের রূপ হচ্ছে কয়েকটি ইবাদতের নাম। এদিকে পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা যেহেতু মসজিদে নামাজ আদায়, রমজানের রোজা রাখা, বাৎসরিক জাকাত দেওয়া ও বাইতুল্লাহ শরিফে হজ করাকে নিষেধ করে না, তাই তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু যারা দ্বীনের সঠিক বুঝ রাখেন, তারা জানেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক। যে মতবাদ মানুষের জীবনের সব শাখায় আল্লাহর শরিয়তকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে স্পষ্ট ও কঠিন ইসলামবিরোধী কোনো মতবাদ আছে কি? হায়, যদি তারা তা বুঝত!

এ প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিন্ত থাকে। কেননা, তারা জানে যে, কেউ তাদের কাফির ও দ্বীন থেকে বহিস্কৃত বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় নাস্তিকতাকে প্রকাশ করেনি। তাদের কাফির না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং এসব সংস্থা ও সংগঠনকে প্রতিরোধ করার ও সকল বাতিলকে নস্যাৎ করার তাওফিক দান করেন। আমিন!

সারকথা

নিঃসন্দেহে উভয় প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতাই সুস্পষ্ট কুফরি। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়, তবে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে; চাই তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, সামাজিক বা যেকোনো শাখা হোক। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলামের প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফির ও পথভ্রষ্ট; যদিও তা পরিমাণে সামান্যই হোক না কেন।

---

১২. ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দুভাগে বিভক্ত করা হলেও উভয়টির একই বিধান। অর্থাৎ উভয় প্রকারই কুফরি।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইমান ভঙ্গের অনেক কারণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে, তারা বিশ্বাস করে যে, নবিজি ﷺ-এর আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, তাঁর ফয়সালার চেয়ে অন্য কারও ফয়সালা উত্তম। আর এটি যে ইমান ভঙ্গের কারণ, তাতে কারও মতানৈক্য নেই।

ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের শ্রেণিভাগ

ইসলামি বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ মতালম্বীরা সংখ্যায় অগণিত। তাদের অনেকে লেখক, সাহিত্যিক বা সাংবাদিক, কেউ ইসলামি চিন্তাবিদ, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে অবস্থান করছে। তাদের বিরাট একটি অংশ বিভিন্ন মিডিয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে কর্মরত ও কর্তৃত্বকারী। এ ছাড়া অন্যান্য পেশায়ও তাদের সংখ্যা কম নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা

ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি পরিভাষা, যা দ্বীনকে দুনিয়া থেকে পরিপূর্ণ পৃথক করাকে বুঝিয়ে থাকে। বস্তুবাদের সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একপ্রকার নাস্তিকতার অর্থ ও সংজ্ঞার সমার্থক।[১৩]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন এক মতবাদ, যার অধীনে সকল ধর্ম ও জড়বাদী আদর্শ স্থান পায়। যে জড়বাদ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে খালি। তাই বলতে গেলে এখানে সকল ধর্ম ও আদর্শ; চাই তা বাতিল হোক বা সঠিক হোক—সকলের সমঅধিকার রয়েছে। ফলে এখানে কুফর ও নাস্তিকতার সকল প্রকার, যেমন : ম্যাসনারি, অস্তিত্ববাদী, জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও পূজনবাদের সকল প্রকার, তা চাই পাথরপূজা, গোত্রপ্রীতি, বর্ণবাদ যাই হোক—সকল প্রকার কুফর এখানে সমান। এগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

যে মৌলিক বিষয়টির ওপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত, তা হলো ধর্ম ও জীবনের মধ্যকার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করা। যেন ধর্মের সাথে বাস্তব জীবনের সামান্য পরিমাণও সম্পর্ক না থাকে। জীবনের প্রতিটি দিক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক; মোটকথা জীবনের সকল দিকের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা।

ধর্মনিরপেক্ষতার রূপটি এমন নয় যে, জীবনের সাথে ধর্মের কিছু হলেও সম্পর্ক থাকবে অথবা ধর্মের কিছু নিয়ম-রীতি হলেও মানুষের বাস্তবিক জীবনে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু মানুষ সহজে এ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। কারণ, মানবরচিত সংবিধান এ বাস্তবতাকে গোপন রাখে।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র যে অবস্থার মাঝে বিরাজ করছে, তা হলো কুফরি ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থা। যেখানে ধর্মকে এক ঘরে করে রাখা হয়। ধর্মের যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে এবং জমিনের সাথে আসমানি সম্পর্ককে বিচ্ছিরি রকমের উপহাস করা হয়।

ধর্মের এ নিক্ষেপণ এবং ধর্মের প্রতি এরূপ উপহাসকরণ একরকম প্রকাশ্যই চলছে, যা বিভিন্ন কুফরি ও নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্রের মিডিয়াগুলো ফলাও করে প্রচার করেছে। যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ও তার শীর্ণকায় আবর্জনাতুল্য অনুসারী রাষ্ট্রগুলো অথবা স্বল্পসংখ্যক লোকবলবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সে অনুসারী দলগুলো, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার প্রতি আহ্বান করে, বা বাস্তব জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করে দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতিকর দিকগুলো

পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্য, নির্লজ্জ, ঔদ্ধত্য মানব শয়তানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য শয়তানদের একটার নাম হলো কামাল আতাতুর্ক। যে ব্যক্তি তুরস্কের মসনদে বসে, নাস্তিকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ পাপের দিকে আহ্বান করেছিল। সে ইসলামি খিলাফতকে বাতিল ঘোষণা ও আরবদের ভ্রাতৃত্বকে ছিন্ন করেছিল এবং পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হলো, যখন কিছু আরব নেতা এ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নিজেদের স্বর উঁচু করল। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টানরা যেন একই সাথে এর অধীনে বসবাস করে!

১৩. ড. আলি জারিশাহ কৃত আসালিবুল গাজওয়ায়িল ফিকরি : পৃ. নং ৫৯, উস্তাজ মুহাম্মাদ কুতুব কৃত মাজাহিবু ফিকরিয়্যাতিম মুআসিরা : পৃ. নং ৪৪৫

নিশ্চয়ই এ আহ্বান ক্ষতির শেষ সীমায় নিয়ে ফেলেছে। এটি তো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর। কেননা, যদি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আরব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যবিধান করা হয়, তবে ইহুদি বা নাসারাদের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ক্ষতি হবে ইসলামের, অতঃপর মুসলিমদের।

ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি, ভাবধারাকে তাদের কিছু বাতিল গ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত করে, যার মধ্যে বিকৃতি ও সংমিশ্রণের বেষ্টন রয়েছে। যেমন : তাওরাত, তালমুদ, মাশনা। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত হবেন যে, এগুলো তার বাস্তবিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, ইহুদিদের বিকৃতিকরণ ও সীমালঙ্ঘনের ফলে এ সকল গ্রন্থে মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে, এমন কোনো কথা বা জ্ঞান আর অবশিষ্ট নেই।

স্পষ্টত তাদের দ্বীনদারি থেকে বিচ্যুতির ফলে যেকোনো শাসক বা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে জীবনযাপন করলেও তাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। কারণ, তাদের হারানোর মতো তো কিছুই নেই। চাই তা যে সময় বা যে স্থানেই হোক না কেন। আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, কমিউনিজম আন্দোলনের প্রতি সর্বাপেক্ষা আহ্বানকারী হলো ইহুদিরা? এর প্রথম চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্স ছিল ইহুদি। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবকে বেগবানকারী লেনিন ছিল অধিকাংশের মতে এক ইহুদি। এ বিপ্লব প্রতিষ্ঠার সময় ও পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্য ছিল ইহুদি। আরব বিশ্বে কমিউনিজম পার্টিগুলোর প্রতিষ্ঠারা ইহুদি। এভাবে অন্যান্য অঞ্চলের কমিউনিজম কর্তাদের সকলে বা অধিকাংশই ছিল ইহুদি। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়নে ইহুদিদের কোনো ক্ষতি নেই; বরং এতে তারাই অধিক লাভবান হবে। তারাই এ ধর্মনিরপেক্ষতার আবহাওয়ায় অধিক সম্মানিত, অধিক লাভবান ও সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

অন্যদিকে খ্রিষ্টানরাও ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে, এ ধরনের রাষ্ট্রে বসবাসের কারণে তাদের দ্বীনদারি বা মূল্যবোধের কোনো কিছু হারাবে না। তাদের সামান্য পরিমাণও ক্ষতি হবে না। কারণ স্পষ্ট যে, খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার কিছু পর থেকে এর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এটি কিছু আচারের সমষ্টিরূপ বৈ কিছু নয়। এর মাঝে আধ্যাত্মিক কোনো আলোর বিকিরণ নেই, যা আত্মা ও মনে ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। এ মতবাদের সাথে বাস্তবিক প্রয়োগের কোনোই মিল নেই। কেননা, খ্রিষ্টবাদ কোনো নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে না। এটা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনবিধান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। খ্রিষ্টবাদ শুধু গির্জার কিছু আচারের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বা অন্য কোনো মতবাদের অধীনে বসবাসে তাদের কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থাকা না থাকা উভয়টিই তাদের জন্য সমান।

অপরপক্ষে, ইসলাম ও মুসলিমগণ ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যার মানে হলো, ইসলামের কর্তৃত্ব, শাসন ও তত্ত্বাবধান মানবতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। আর এ সত্য সকল গবেষক ও জ্ঞানবান মাত্রই জানেন।

এটি একটি স্পষ্ট বাস্তবতা যে, ইসলাম মানবজীবনের দীর্ঘ সময়ের প্রতিটি অবস্থার নিয়মনীতি বর্ণনা করেছে। এমনকি মানুষ যখন জন্ম নেয়নি, এখনও সে ভ্রুণ অবস্থায় মায়ের পেটে, তখনও তার জন্য নিয়মনীতি ও গুরুত্বের কথা ইসলাম বর্ণনা করেছে।

যদি আমরা ধরে নিই যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে ইসলাম তার প্রতিটি অনুষঙ্গে গুটিয়ে যাওয়া ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার শিকার হবে। যার সারকথা হলো, ইসলামের অস্তগমন ও পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ। কেননা, ইসলামের স্থানে এসে যাবে নাস্তিকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যা খ্রিষ্টবাদ বা পূজনবান কিংবা ইহুদিবাদের মতো প্রভৃতি মতবাদের জন্য ক্ষতিকারক না হলেও মুসলিমগণ এতে নিঃসন্দেহে বিপদে পড়বে। যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চালু হবে, তখন একমাত্র মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতি তাদের সম্পর্কের অর্থই হবে—দ্বীন থেকে বিচ্যুতি, চিন্তা, বিশ্বাস ও আচারের মধ্যে আপসকামিতা।

যখন মুসলিমগণ দ্বীনের খুঁটি ও প্রতিরক্ষা থেকে চিন্তাগত, বিশ্বাসগত, চরিত্রগতভাবে বিচ্যুত হবে, তখন তাদের আর কীই-বা বাকি থাকবে? যখন তারা এসব থেকে বিচ্যুত হবে, তখন তারা কুৎসিত বিকৃত প্রেতাত্মায় পরিণত হবে। তারা সে অপরিচিত বহিরাগত মানুষের ন্যায় হয়ে পড়বে, যাদের প্রতিরোধ শক্তি, দৃঢ় বলবান বৈশিষ্ট্য উবে গেছে।

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদের জীবন দর্শন হলো জড়বাদী বা বস্তুবাদী। এ মতবাদে এই পার্থিব জীবন ইবাদতের স্থান নয়; বরং পুরোপুরি ভোগের বস্তু বলে পরিগণিত। ভোগের পরিমাণও বল্গাবিহীন ও অপরিমিত। এর বাস্তবতা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি। ভোগের সামগ্রী অর্জনের জন্য, লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার করা হয় না। জীবনটা কয়েক দিনের, তাই এ অল্প সময়ে যত বেশি ভোগ করা যায়, যত বেশি অর্থ আয় করা যায়, সেই প্রতিযোগিতাই এখানে তীব্র। জড়বাদী এ সভ্যতায় যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখা যাচ্ছে, পরিবারে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে, যৌনজীবনের যে ভয়ংকর কদর্যরূপ দেখা যাচ্ছে; তা জাহিলি যুগের আরব সমাজের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুঁজিবাদের উদ্ভব

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে সে সমাজে সামন্তবাদ[১৪] প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার বিরুদ্ধে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব ঘটে। এতে কৃষকশ্রেণির ওপর অত্যাচার কিছুটা কমে আসলেও কোনো সুরাহা হয়নি। এ সময়ে ইউরোপে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়। তখন জমিদাররা ব্যাপকহারে কল-কারখানায় বিনিয়োগ করতে থাকে। হস্তশিল্পে তৈরি হওয়া জিনিস তখন থেকে মেশিনে তৈরি হতে থাকে। কুটিরশিল্পের মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কৃষক, শ্রমিক ও এ ধরনের কুটির শিল্পের মালিকগণ কল-কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়। পুঁজিপতিরা এ শ্রমিকদের স্বল্পই বেতন দিত। ফলে শ্রমিকদের বিরাট সংখ্যার বিপরীতে স্বল্পসংখ্যক বুর্জোয়া শ্রেণি ধনের মালিক হতে লাগল, যার কারণে ধন-বৈষম্য ক্রমেই প্রকট হতে থাকল ।

পুঁজিবাদের প্রকৃত রূপ

পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা, যা সম্পদ উৎপাদন ও উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, পুঁজিবাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সম্পদ। এটি এমন এক সংগঠন, যাতে পণ্য সম্পর্ক থাকে মুখ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবার ক্রমাগত ক্ষুদ্র নিঃসঙ্গ পর্যায়ে নিছক বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার জায়গায় পরিণত হয়। রাষ্ট্র এখানে শাসন ও শোষণে হাত পাকিয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের দালালিতে গিয়ে ঠেকে।

এ থেকে বুঝে আসে যে, পুঁজিবাদ এমন ব্যবস্থার নাম, যাতে সম্পদই হলো সকল সমস্যার সমাধান ও যৌক্তিকতার ভিত্তি। এটি সকল পরিমাপকের উর্ধ্বে, চাই তা ধর্মীয় বা প্রচলিত নিয়ম হোক, কিংবা মূল্যবোধ ও চারিত্রিক দিক হোক। তাই রাজনৈতিক সমস্যা, ব্যষ্টিক ও সামাজিক আচার-আচরণসহ সকল দিক ও গুরুত্ব বিবেচনায় কল্যাণের পরিমাপক হলো সম্পদ। ফলে প্রমাণ উপস্থাপন বা দাবি পেশ করার জন্য কারও কাছে চারিত্রিক, দ্বীনি বা আসমানি শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না।

পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি

জড়বাদী বলতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উদ্দেশ্য। যার মূলমন্ত্র হলো, খাও, দাও ফূর্তি করো। দুনিয়া ভোগের জায়গা, তাই এখানে ভোগ করতে থাকো। আখিরাত বলতে কোনো জগৎ নেই! তাই দুনিয়াতেই সব উপভোগ করে নাও!

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন

এ ব্যবস্থায় সরকার একজন ব্যক্তিকে যতটুকু সুযোগ দেয়, ব্যক্তি ততটুকু ধর্ম পালনেরই কেবল সুযোগ পেয়ে থাকে। পুঁজিবাদে সব ধর্মই সহাবস্থান করে একই সাথে। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ না হয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন চক্রের কোনো রকম বিঘ্নতা না ঘটিয়ে বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের কোনো আশঙ্কা সৃষ্টি না করে ব্যক্তি তার নিজ ঘরের কোণে অথবা ইবাদতখানায় ঘুপটি মেরে ধর্ম পালন করতে পারে।

---

১৪. এ ব্যবস্থায় রাজা তার অধীন সামন্ত জমিদারদেরকে জমি ভাগ করে দিত। সামন্ত জমিদাররা সে জমিকে নিম্ন ভূস্বামীদের নিকট বণ্টন করে দিলে নিম্ন ভূস্বামীরা তা কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দিত। কৃষক মূলত চাষ করত, তবে জমি বা ফসলে তাদের কোনো অধিকার থাকত না। তাদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে উৎপাদিত ফসলের নগন্য পরিমাণই তারা ভোগ করতে পারত।

অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা

এখানে ব্যক্তি নিজের অর্থসম্পদ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারে। একজনের নিজের খেয়াল-খুশিমতো যেকোনো কিছুই করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার এই স্বাধীনতার সামনে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে কেবল তারই তৈরি আইন, স্বৈরাচারী শাসক ও ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক শক্তির। ভোগের ক্ষেত্রে উন্মত্ত-উন্মাদ হয়ে পড়লেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সে নিজে নিবৃত্ত না হলে তাকে নিবৃত্ত করার সাহস কারও নেই। পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ মানবসন্তান ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যাক, কিন্তু তার টেবিলে খাবারের পসরা থাকা চাই। এমনিভাবে বিনিয়োগ, বন্টন, উৎপাদন, পারিবারিক জীবনসহ সর্বত্রই তার এই স্বাধীনতা স্বীকৃত ও ব্যবহৃত।

অবাধ অর্থনীতি

উৎপাদকদের মধ্যে উৎপাদনের নতুন নতুন কলাকৌশল, অধিক মুনাফা, কম খরচে উৎপাদন ও কম মূল্যে ভোক্তাদের কাছে দ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকে সব সময়। বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদকশ্রেণি শ্রমিকদের ওপর চালায় নির্মম শোষণ, তাদের বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়, কম পারিশ্রমিক প্রদান করা এবং কম টাকায় বেশি শ্রম আদায়ের চেষ্টা করা হয়। পুঁজিবাদ অর্থ উপার্জনের জন্য হারাম-হালালের কোনো তোয়াক্কা করে না।

ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা

এই অর্থব্যবস্থায় দেশের সম্পদের অধিকাংশই সমাজের পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সমাজের আয়-ব্যয়ে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হতে থাকে।

গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন

এ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে ধরা হয় শাসনের নিয়ম হিসাবে। তবে মূলত ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতেই কুক্ষিগত থেকে যায়। বেচারা গরিব মানুষের সামনে গণতন্ত্রের মুলো ঝুলে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো বিশেষ উন্নতি হয় না।

পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা যখন নিজ দেশে বাজার পায় না, তখন তারা অন্য দেশের বাজারের দিকে হাত বাড়ায়। ধীরে ধীরে সেখানে কারখানা বানায়। পণ্য উৎপাদন করে। একসময় সে দেশের অর্থরাশি কুক্ষিগত করে। সে দেশের সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে আসে। এমনকি অনেক সময় সে দেশের ওপরই কবজা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সংক্ষেপে পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্র

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ।

২. অর্থনৈতিক বৈষম্যের চরম অবস্থা। ১৯৯৬ সালের রিপোর্ট মতে ধনী-দরিদ্রের জীবনযাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০ : ১ হতে ৭০ : ১ এ উন্নীত হয়েছে।

৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ।

৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের নিত্যকার দৃশ্য।

৫. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লো পয়জনিং।

৬. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি।

৭. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়লগিরি গ্রহণ।

৮. ইসলামের মোকাবেলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।[১৫]

---

১৫. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কৃত, ইসলামি অর্থনীতি : পৃ. ২৯১ (দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাজশাহী- ৪র্থ সংস্করণ ২০০৫)

পুঁজিবাদের ফলাফল

এ মতবাদে দান-দক্ষিণা, লজ্জা-ভদ্রতা, প্রতিবেশী ও মেহমানের আপ্যায়ন, দুর্বলের ওপর দয়া, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার মতো দ্বীনি বা মানবিক মূল্যবোধ থাকার ধারণা পর্যন্ত করা দুষ্কর। পুঁজিবাদে ধর্মের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। তবে এতটুকু ছাড় দেওয়া হয় যে, চরম হীনতার সাথে ধর্ম পালন করা যায়। ধর্ম এতটুকু গুরুত্বহীনতায় পৌঁছে যে, ঘরের কোণে বা ইবাদতখানায় কিছুটা আশ্রয় পায়।

মোটকথা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানবজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যষ্টিক, চৈন্তিক দিকসহ সকল ক্ষেত্র ধর্মের নিয়ন্ত্রণাহীন। কেননা, পুঁজিবাদ ভিত্তিগতভাবে পুরোপুরি ধর্মকে মানুষের বাস্তবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে জীবন এক জিনিস, ধর্ম অন্য জিনিস। ধর্মের সাথে জীবনের কোনো সম্পর্কই নেই।

যদি সত্য, কল্যাণ, গুণগতমান বিবেচনার ক্ষেত্রে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়, তবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? নিঃসন্দেহে তখন অবস্থা এমন বেগতিক রূপ ধারণ করবে যে, আসমানি শিক্ষা থেকে মানবজীবন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জীবন দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যে পূর্ণ হয়ে যাবে, জীবন ভরে যাবে দুর্দশায়।

এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।'[১৬]

যখন সমাজ থেকে দ্বীনের সূর্য অস্তমিত হবে, কল্যাণের ঐশী আহ্বান বন্ধ হয়ে যাবে, এমনকি মানুষের মন-মানসিকতা থেকে আল্লাহভীতি লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন কিসের সম্ভাবনার ঘনঘটা দেখা দেবে? হীনতা, নীচতা, ঔদ্ধত্য, পতনের আর কোন স্তরটি বাকি থাকবে?

পুঁজিবাদে কল্যাণ আছে কি?

যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ও অবাধ মুনাফা নিষিদ্ধ নয়; বরং এর ওপর ভিত্তি করেই এ ব্যবস্থার ভিত্তি, তাই যে কেউ যেকোনো পণ্য হারাম হোক বা হালাল, ক্ষতিকর হোক বা উপকারী, মোটকথা অর্থ উপার্জিত হয়, এমন সকল দিকই পুঁজিবাদে বৈধ।

নিঃসন্দেহে মানুষ এমন অবাধ সুবিধার ফলে বিকৃতমনা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হবে। পুঁজিবাদের মাঝে বাহ্যত যে কল্যাণ আছে, তা খুবই সংকুচিত। এ কল্যাণ স্বার্থবাজ দাম্ভিকদের জন্যই সংরক্ষিত। নির্দয় জালিমরাই সে কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। যাদের কোনো কিছুই তৃপ্ত করতে পারে না, এমন লালসাকামীদের জন্যই এ অধিকার প্রযোজ্য।

অন্যদিকে পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় যে পরিবার থেকে দ্বীনের আলো অদৃশ্য হয়ে যায়, সে পরিবার বিভিন্ন ফাসাদ ও ফাটলের কবলে পড়ে পদে পদে হোঁচট খায়। পরিশেষে পরিবারটি ভেঙে খান খান হয়ে যায়। যেমনটা আমরা পশ্চিমা বিশ্বের পরিবারসমূহে দেখি যে, তাদের প্রায় প্রতিটি পরিবারই আমিত্ববোধ, কলহ ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। পরিশেষে তালাক ও অশান্তিই তাদের শেষ পরিণতি।

এমনিভাবে ব্যক্তি ও পরিবার নিয়ে গঠিত একটি সমাজ যখন পুঁজিবাদ ব্যবস্থার অধীনে আসে, তখন তাতে কেবল বিরোধিতা ও বিশৃঙ্খলাই বিরাজ করে। বিভিন্ন ফাসাদ, অপরাধ ও নিকৃষ্ট কার্যকলাপে উত্তাল হয়ে ওঠে। সামাজিক রোগব্যাধির অন্ত থাকে না। এ সমাজে দুঃখ, হতাশা থেকে জন্ম নেয় আত্মহত্যার মতো ঘটনা।

অতঃপর বিভিন্ন নেশার প্রতি আসক্তি। যেমন : মদ, আফিম, ড্রাগ, ভেলিয়াম। যৌনাঙ্গসমূহে আক্রান্তকারী সংক্রামক যন্ত্রণাদায়ক রোগ। যেমন : হারপেস, সিফিলিস, গনোরিয়া। অতঃপর আসে শরিয়ত বহির্ভূত পন্থায় আসা সন্তানের কথা, যা হারাম পন্থায় ব্যভিচারের মাধ্যমে এসেছে।

১৬. সুরা তহা : ১২৪

অতঃপর তালাকের পরিমাণ, যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। দিনদিন বৈবাহিক জীবন নিয়ে মানুষের মাঝে তাচ্ছিল্যতা বাড়ছে। দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিতে আগ্রহী হচ্ছে। যতদিন বাজারে বাজারে নারী, মদ্যশালা ও পতিতালয় সহজলভ্য হবে, ততদিনই এ অবস্থা বিরাজ করবে।

সারকথা, বহু পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে ব্যাপক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, যা ধ্বংস, বিনাশ ও বিপথগামিতার দিকে নিয়ে যায়। তারপর আসে বিভিন্ন স্বার্থপরতা ও আত্মিক রোগ। পরিবারের মধ্যে দেখা দেয় বিভেদ। ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আদালতের কক্ষে এনে দাঁড় করায়। পরস্পরের মাঝে মামলার ঠুকাঠুকি চলে। তালাক, ঝগড়া-বিবাদ ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা চলতে থাকে। এমনি করে একটি সমাজকে অধোমুখী করে ধ্বংস করে ফেলে। বিভিন্ন অশ্লীলতা, পাপাচারিতা সমাজকে নষ্ট করে ফেলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন সব মাধ্যমকেই আশ্রয় করে চলে, যা সম্পদ অর্জনে তার প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। পুঁজিবাদ কর্তৃক গৃহীত এ সকল মাধ্যম দ্বীন ও তার প্রত্যাশার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। আসমানি কিতাবে নাজিল হওয়া হালাল-হারাম বিধানের ব্যাপারে মোটেও চিন্তা করে না; বরং হালাল-হারামের এ চিন্তার ব্যাপারে পুঁজিবাদের রায় হচ্ছে, এটি কেবলই পশ্চাদগামিতা, যাকে মোটেও তোয়াক্কা করা উচিত নয়।

এ ব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জনের যে প্রধান মাধ্যমগুলো রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো সুদ। এ বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে আমরা এ আলোচনা করেছিলাম যে, ইসলাম বীভৎসতা ও ন্যাক্কারজনক অপরাধগুলোর মাঝে সুদকে জঘন্যতম বলে থাকে। কিন্তু সুদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ অর্জনের একটি অভিজাত পন্থা বলে পরিগণিত হয়। এর মাধ্যমেই সম্পদ অর্জন ও তার প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এ সুদি ব্যবস্থার ফলে সুদগ্রহীতার অন্তরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যা তাকে ঘৃণ্য স্বার্থবাজে পরিণত করে। যার ফলে তার অভ্যাসে পরিণত হয় যে, সে ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে একে একে তাদের সবকিছু কেড়ে নেয়। তাদের অভাবকে সম্পদ উপার্জনের সুযোগ হিসাবে কাজে লাগায়। সুদি ঋণ দেওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট হারে তার সুদকে বাড়াতে থাকে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের রেট বসাতে থাকে। এ ঘৃণ্য সুযোগ গ্রহণকে ইসলাম হারাম করেছে আর পুঁজিবাদ তাকে বৈধতার মান দিয়েছে। এ ধরনের সুযোগ হরেক রকমের, যার মাঝে কয়েকটি হলো—বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য, ইন্স্যুরেন্স, জোরপূর্বক সম্পদ কেড়ে নেওয়া, ঘুষ গ্রহণ ও অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করা।

কমিউনিজম

কমিউনিজম নাস্তিকতাপূর্ণ ও উগ্রপন্থী একটি মতবাদ; বরং অনেকাংশে এটি সকল কুফরি মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কমিউনিজম অন্যান্য মানবরচিত মতবাদের তুলনায় আল্লাহ, নবি-রাসুল ও ধর্মের ব্যাপারে অধিক পরিমাণে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে থাকে। শুধু নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ই নয়; বরং এই গোষ্ঠীটি সমগ্র মানবতাকে ঘৃণা করে এবং একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে হত্যা-লুণ্ঠনের জন্য লেলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

কমিউনিজমের এমন অকল্পনীয় ও অদ্ভুত চরমপন্থার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে জানার জন্য স্বয়ং এর প্রবর্তক কার্ল মার্ক্সের দিকে তাকালেই সহজে আমরা বুঝতে পারব। কার্ল মার্ক্স ছিল নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একজন মানুষ। অন্যদের সাথে যার কোনোই মিল ছিল না। সে ছিল বক্র ও অস্বাভাবিক হৃদয়ের অধিকারী মানসিক রোগের ব্যাধিমন্দির। অবশ্যই তার সবচেয়ে কাছের মানুষরাই তার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে থাকবে। একই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত তার ছাত্র ও সহচর, 'কার্লমার্ক্স : জীবন ও কর্ম' গ্রন্থের রচয়িতা অটো রুহুল[১৭] বলেন, 'কার্ল মার্ক্স মানসিক প্রফুল্লতাহীন ও রুগ্ন প্রকৃতির ছিল। সর্বদা অস্থিরচিত্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে থাকত। সর্বদা কুমন্ত্রণায় পূর্ণ ছিল তার অন্তর। যেমন নাকি কেউ কুমন্ত্রণার বশবর্তী হলে তার অন্তর কূটকৌশলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।'[১৮] ধারণা করা হয়, এমন হিংসা ও ঘৃণার ওপর তার বেড়ে ওঠার কারণ হয়তো ইহুদিদের সাথে তার সম্পৃক্ততা। আর সে সময় ইহুদিদের সাথে সম্পৃক্ততাকে খ্রিষ্টানরা কষ্টদায়ক ও অবিশ্বস্ততা বলে ভাবত।

কমিউনিজমের উৎপত্তি

পুঁজিবাদের উত্থানের পর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী যাবৎ পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন বেগবান হলো। পুঁজিবাদের ফলে সৃষ্ট ধন-বৈষম্য থেকে উত্তরণের জন্য সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের উৎপত্তি ঘটল। এর প্রবর্তকরা স্বপ্ন দেখেছিল, এমন একটি স্বর্গরাজ্যের যেখানে 'বুর্জোয়া সম্প্রদায়'-এর বিলুপ্তি ঘটে শ্রেণিবৈষম্যহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, এ সব স্বপ্নদ্রষ্টারাই একসময় হয়ে ওঠে নতুন শোষকসম্প্রদায়।

কমিউনিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের মূলভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিছক কোনো দর্শন নয়; বরং তথাকথিত বিজ্ঞানের সমগোত্রীয়। যেহেতু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিজ্ঞান থেকে শক্তি আহরণ করেছে বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জগৎ ও জীবনের সার্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান করে থাকে, তাই একে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও বলা হয়।

জার্মান দার্শনিক হেগেলের তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, থিসিস, এন্টিথিসিসি ও সিনথিসিস। আজকের বাস্তবতাই থিসিসের ফল। এই থিসিসের বিরুদ্ধে তৈরি হয় এন্টিথিসিস। দুয়ের সংঘর্ষে উদ্ভব হয় সিনথিসিসের। এই সিনথি সিসই পরবর্তীতে পুনরায় থিসিস হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধমূলক বিকাশের ধারণার দ্বারা মাক্স বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মার্ক্স ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে তার তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াসে বারবার শ্রেণি সংগ্রাম প্রসঙ্গকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মতে পৃথিবীর বিকাশ হয়েছে বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের মধ্য দিয়ে। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ও প্রকৃতির নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমেরই বেঁচে থাকার অধিকার তত্ত্ব (Survival of the Fittest) মার্ক্সকে তার মতবাদে আস্থাশীল হতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। ফলে তারা জোরেশোরেই প্রচার করতে থাকে, পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তিমানরাই শুধু টিকে থাকবে, অন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের মতে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে।

এখন আমরা মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দর্শনকে মার্ক্সের প্রস্তাবিত কমিউনিজম বা শ্রেণিহীন সমাজ দ্বারা বোঝার চেষ্টা করি। আমরা জানি, পুঁজিবাদের বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে মার্ক্স কমিউনিজমের প্রস্তাব দেয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ওই সময়ে বিরাজমান ছিল থিসিস হিসাবে। মার্ক্স পুঁজিবাদের বিপরীত এ্যান্টিথিসিস বা প্রতিপ্রস্তাব হিসাবে কমিউনিজমের প্রস্তাব দেয়। এই থিসিস (পুঁজিবাদ) এবং এ্যান্টিথিসিসের (কমিউনিজম) মিথস্ক্রিয়ায় সভ্যতা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হিসাবে

---

১৭. Karl Marx. His life and work by Otto Rühle translated by Eden Cedar Paul.
১৮. উস্তাজ আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ কৃত কিতাবুশ শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যা : পৃ. নং ৩১

নতুনভাবে বিকশিত হয়েছে। আর এই নতুন বিকাশটা একটা প্রস্তাব হিসাবে দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্থব্যবস্থার দ্বান্দ্বিকতার সংশ্লেষণে তৃতীয় এক অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আর সেটা হলো মিশ্র-অর্থব্যবস্থা। এখানে এসে মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন দ্বান্দ্বিক উপায়ে নিজের প্রস্তাবকে নাকচ করে নতুন রিলেশন অব প্রডাকশন তৈরি করে।

এখন কথা হলো, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যেহেতু বৈজ্ঞানিক আর এদিকে মানব সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেহেতু চিরন্তন, তাই সভ্যতা বিকাশের এক পর্যায়ে মানুষের আচরণগত মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ বিকাশ লাভ করতে পারে বস্তবাদের দ্বান্দ্বিক নিয়মে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মার্ক্স প্রস্তাবিত কমিউনিজম বা শ্রেণিহীন সমাজে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন কাজ করবে কিনা? মানবসমাজ যেহেতু গতিশীল, তাই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ শ্রেণিহীন সমাজেও একইভাবে কাজ করবে। একটা বিশেষ পর্যায়ে শ্রেণিহীন সমাজে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে এবং নতুনভাবে ইতিহাস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী উপায়ে বিকাশ লাভ করবে। এই জায়গায় এসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তার আবিষ্কারককেও অস্বীকার করে, তাকে টেক্কা দিয়ে নতুন রূপ লাভ করে।

ধর্মের উৎখাত

সমাজতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর হলো নাস্তিক্যবাদ (Atheism)। মার্ক্স-এঙ্গেলস গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে, ধর্মই সব অনর্থের মূল। ধর্মের কারণে সমাজে শোষণ দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তাই এর বিনাশ ও উচ্ছেদ অপরিহার্য।

৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ

এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা অর্জন নিষিদ্ধ। এ মতবাদে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণ বিলুপ্ত হবে। ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হবে।

৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, কলকারখানা, জমি, সম্পদ ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত থাকবে। এই অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয় বণ্টনের মূলনীতি হলো, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। এভাবে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. রাষ্ট্রীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

এখানে ব্যক্তিসত্তার কোনো মূল্যই নেই। তার কথা বলার, প্রতিবাদ করার কোনোই অধিকার নেই। তার জীবনের সর্বক্ষেত্র—পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। যতটুকু স্বাধীনতা পার্টি অনুমোদন করবে, তার বেশি চাওয়ার অধিকার তার নেই। পার্টিই ঠিক করে দেবে, কেমন হবে তার আচরণ, কর্মক্ষেত্র, বিশ্বাস; এমনকি তার পরিবারও। এর ব্যত্যয় ঘটল কি না, তার তদারকি ও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রয়েছে গোয়েন্দা বাহিনী। সে বাহিনী এতই বিশাল এবং এতই ব্যাপক তার নেটওয়ার্ক যে, সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে, পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে ও পিতা তার পুত্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে। পার্টি বস—এলাকার কমরেড চীফের সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সর্বপ্রধান বা একমাত্র ব্রত।

৬. শ্রেণিহীনতা

কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মূলমন্ত্রটি হলো, এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সবাই সমান অধিকার লাভ করবে। ধনী-গরিব বলতে কোনো শ্রেণিবিভাগ থাকবে না।

৭. সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

কমিউনিজমের এক পর্যায়ে এসে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, একদল বলে ওঠে, এ মতবাদ বিশ্বে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সবাইকে এ মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। অন্যদিকে অপরদল বলে, এ ব্যবস্থা যে দেশে প্রতিষ্ঠিত তাতেই

সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রথম দলকে উগ্র সমাজতন্ত্রী বা উগ্র কমিউনিজম বলে। আর দ্বিতীয়টিকে নরমপন্থী কমিউনিজম বলে। উগ্র সমাজতন্ত্রী বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরবর্তীতে শক্তিশালী হয়ে বিভিন্ন দেশ দখল করতে থাকে। একসময় তারা আফগানিস্তানে তাদের নাপাক পা ফেললে এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের ঘন্টি বেজে ওঠে।

কমিউনিজমপ্রীতির কারণ

প্রত্যেক বিবেকবান লোকই এই প্রশ্ন করে থাকবেন যে, এমন হিংসুটে, বক্র ও ব্যতিক্রমধর্মী মতাদর্শ কীভাবে সুপথ প্রদর্শক, মানবতাকে কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী এবং যুগের পর যুগ ধরে দেশ ও জাতির দর্শন হতে পারে? এমন পচা থিওরি কীভাবে জাতিকে ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি-নিরাপত্তা ও সৌহার্দ্য-সহায়তা উপহার দিতে পারে? সেক্যুলারিজম মানবতার এসব প্রয়োজনীয় চাহিদার কোনোটিই এ পর্যন্ত জোগান দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ, স্বয়ং সেক্যুলারিজমের প্রবর্তক কার্ল মার্ক্সের মধ্যেই এসবের ছিটেফোঁটাও ছিল না। সুতরাং যার মধ্যে এগুলোর কোনোটিই বিদ্যমান নেই, সে কীভাবে জাতিকে ভ্রষ্টতার আঁধার থেকে তুলে এনে আলোর পথের দিশা দেবে!?

একমাত্র পথভ্রষ্ট ও অস্বাভাবিক স্বভাবের অধিকারীরাই মার্ক্সবাদের মতো ভ্রান্ত ও চরমপন্থী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। এই প্রকৃতির মানুষগুলো মূলত রোগাক্রান্ত। এখানে রোগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বাহ্যিক আলামত, যেগুলো চালচলনের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। যেমন : শক্ত হৃদয় ও কঠিন স্বভাবের অধিকারী হওয়া, নির্দয় ও নম্রতাশূন্য হওয়া, অধিক পরিমাণে ধোঁকাবাজি করা, নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা ও নাশকতামূলক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং উত্তম ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতিকে বর্জন করা।

এগুলো ছাড়াও কমিউনিজমপ্রীতির আরও চারটি উল্লেখযোগ্য কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

জুলুম-নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমা উপনিবেশের আগুনে দগ্ধ হওয়া বিভিন্ন জাতির ওপর চলা নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকে এ মতাদর্শের দিকে এসেছে। পশ্চিমাদের এই অবৈধ উপনিবেশের ভিত্তি ছিল অন্যায়-অবিচার, শত্রুতা ও সীমালঙ্ঘনের ওপর। চার্চের শোষণ-পীড়ন চলছিল সমগ্র ইউরোপ জুড়ে, এমনকি এ অত্যাচার আফ্রিকাতেও চলছিল নির্মমভাবে। সেই সাথে রাজ-ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই অত্যাচার সমাজের সর্বত্র দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়ী ছিল। এমন অকথ্য নির্যাতন ও অবিচারের ভয়ে নিপীড়িত মানুষগুলো এই ভেবে মার্ক্সবাদীদের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করে যে, এতেই হয়ত আমরা এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে রেহাই পাব।

ধনীদের প্রতি ঈর্ষা

ধনী, জ্ঞানী, প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ লোকদের প্রতি ঈর্ষাও এ মতবাদের সাথে যুক্ত হওয়ার একটাই কারণ। এমন লোকেরা দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রাণবন্ত যোগ্যতার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ ও প্রাচুর্যতা অর্জনের জন্য নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর নির্যাতন করে থাকে। আর এদিকে অক্ষম ও অযোগ্য মানুষেরা জীবিকার স্বল্পতা ও কষ্টের ছায়াতলে জীবনযাপন করে। তাই অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই এ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে।

প্রাচুর্যময় জীবনের লোভ

যারা মার্ক্সবাদ নিয়ে আন্দোলন করে এবং এর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দোহাই দেয়, তারা নিজেদের মনোবৃত্তি, পদোন্নতি এবং উন্নত ও প্রাচুর্যময় জীবনযাপনের জন্য অতি নিকৃষ্ট পন্থাও অবলম্বন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না। তাদের অধিকাংশই মূলত এর মাধ্যমে কিছু অর্থ-সম্পদ উপার্জন করার লক্ষ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে সচ্ছল হতে এতে যোগ দেয়।

বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ

বিকৃতমনা হওয়া বা প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে অনেকে নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট ও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, একমাত্র বক্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও অস্বাভাবিক হৃদয়ের অধিকারীরাই সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনাকে সানন্দে গ্রহণ করে নিতে পারে। আর কেমন যেন এমন প্রকৃতির মানুষগুলো মার্ক্সীয় চিন্তা-চেতনার

মাঝে তাদের প্রাণময় ও সুখকর জীবনযাপনের সকল উপকরণ পেয়ে যায়। এ জন্যই অধিকাংশ সাম্যবাদীরা অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিক হয় না; বরং তারা অনেকটা অস্বাভাবিক প্রকৃতির, কুরুচি ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। কমিউনিজমের মাঝেই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পায়। তাদের এসব কার্যকলাপ, যেমন : দাহযুক্ত হিংসা, নির্বুদ্ধিতাময় প্রতারণা ও অপছন্দনীয় অন্ধত্ব খুবই নিন্দনীয় বিষয়।

এ আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট লোকেরা এর বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি তাদের সাম্যবাদের নিয়ম-নীতি, গতি-প্রকৃতি, চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তাদের মুখ থেকে কেবল ধারণাপ্রসূত কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য শোনা যাবে। এরাই হচ্ছে ধোঁকাগ্রস্ত ও অজ্ঞ, যাদের ব্যাপারে ফ্রীম্যাসনিদের[১৯] দেওয়া অন্ধ উপাধিটি প্রযোজ্য।

কমিউনিজমের মূলনীতিসমূহ

কমিউনিজমের চারটি মূলনীতি নিম্নরূপ :

দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রুপ

কমিউনিজম সম্পূর্ণ একটি বস্তুবাদী ও নাস্তিকতামনা মতাদর্শ, যা আল্লাহ, নবি-রাসুল ও দ্বীন-ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে। মার্ক্সবাদের দর্শনতত্ত্ব বিষয়ে কার্ল মার্ক্স নিজেও বলত যে, এটি একটি বিতর্কিত, বস্তুবাদী, নাস্তিক্যমনা এবং ধর্মের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন মতবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ইতিহাস যার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে।[২০]

মার্ক্সবাদের নীতির ব্যাপারে লেনিন বলেছে, এই মতাদর্শের পক্ষে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্যই এটা সকল জড়বাদী মতাদর্শের প্রাথমিক নীতি। কিন্তু মার্ক্সবাদ এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং তারা আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, আমরা ধর্মের জন্য কীভাবে যুদ্ধ করব, তা জানা আবশ্যক।[২১]

আর মার্ক্সবাদ এমন একটি জড়বাদী ও অবিশ্বাসী মতাদর্শ, যা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার ব্যাপারে তারা আল্লাহ তাআলার পূর্ণতাকে গ্রহণ না করে বস্তুবাদী ধারণা লালন করে। তাদের এমন চিন্তা-চেতনার পক্ষে প্রবৃত্তিপূজা ছাড়া কোনো প্রামাণ্য বা যুক্তিগত সনদ-সূত্র নেই। কোনো সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তি এমনটি মেনে নেবে না। মার্ক্সের এমন অস্বীকৃতি ও ঔদ্ধত্য শুধু চেতনাহীন গির্জার মধ্য থেকে উৎপাদিত ঘৃণিত কর্মের ফসল বৈ কিছু নয়। যে গির্জাগুলো ইহুদিদের বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন রকম শাস্তিতে ভুগিয়েছে। যেমন : হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস-বিনাশ, বিচ্ছেদ-বিভক্তি ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের কষ্টদান। ইসলাম ও আল্লাহ তাআলার প্রতি কার্ল মার্ক্সের অবজ্ঞার পেছনে গির্জার এ সমস্ত অমানবিক নির্যাতনের প্রভাব রয়েছে।

আর নিঃসন্দেহে দ্বীনে ইসলাম ও আল্লাহ তাআলার প্রতি এমন অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতি মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের বিপরীত। এটা অবশ্যই মানবজাতির আত্মিক ও মানসিক স্বভাবের সাথে এক নির্লজ্জ শত্রুতা। মানুষ অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্বীকার করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং দ্বীনে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর তারা জন্মগ্রহণ করেছে। এটা তাদের আকিদা-বিশ্বাস, মন-মস্তিষ্ক ও ধ্যান-ধারণার সাথে মিশে আছে। শুধু তাই নয়; বরং সত্য হলো, মানুষ সুখে-দুঃখে, আশায়-শঙ্কায়, সঙ্গতায়-নিঃসঙ্গতায়; এমনকি মৃত্যুর সময়েও এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য, তিনি বিপদে রক্ষাকারী এবং তিনি সকল কিছুর চেয়ে বড়। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ার সবচেয়ে সঠিক প্রমাণ হলো, সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষ যেকোনো বিপদে আল্লাহ অভিমুখী হয়। সুতরাং যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্তি মেনে নাও নেয়, তবুও সে প্রয়োজনের সময় প্রভুত্ব দাবিদারদের মোকাবেলায় তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কার্ল মার্ক্সের মন্তব্য হলো, 'ধর্ম মানুষের জন্য আফিমস্বরূপ।' তার এমন মন্তব্যের কারণ হলো, দেশ ও জাতির প্রতি; বিশেষ করে ইহুদিদের প্রতি গির্জার জুলুম-নির্যাতন।

এমন অন্যায় নীতির ক্ষেত্রে কার্ল মার্ক্সের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এবং খ্রিষ্টবাদের সাথেও আমাদের আকিদা-দর্শনের কোনো যোগসূত্র নেই। তবে খ্রিষ্টবাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, 'ইসা ﷺ প্রচারিত প্রকৃত খ্রিষ্টধর্ম একটি

---

১৯. ইহুদিদের গোপন একটি সংগঠন।
২০. মুহাম্মাদ কিব্বা অনূদিত এবং আফিফ আখদার সম্পাদিত আল-মাওকিফ মিনাদ দ্বীন লি লেনিন : পৃ. নং ২৫
২১. প্রাগুক্ত

প্রাক্তন আসমানি ধর্ম, যা মানুষের ওপর জুলুম করে না; বরং মানুষকে শান্তি, কল্যাণ, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের প্রতি আহ্বান করে।' পক্ষান্তরে যদি কোনো জবরদখলকারী স্বৈরাচার পূর্বের সেই খ্রিষ্টধর্মের নামে মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করে, তাহলে প্রকৃত আসমানি খ্রিষ্টধর্মের ওপর দোষ চাপানোর কোনো সুযোগ নেই। কেননা, প্রাক্তন হোক বা চলমান, কোনো আসমানি ধর্মেই অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অবশ্য বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আসমানি ধর্ম অবিকৃতভাবে বিদ্যমানও নেই।

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম মানুষকে উদ্যমতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দান-দক্ষিণার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সকল অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যা-ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান করে। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই সকল মিথ্যা, অবিচার, জুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করার সঠিক কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করেছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার অপরাপর সকল ধর্ম-দর্শন, তন্ত্র-মন্ত্র, নিয়ম-নীতির ব্যাপারে এমনটি ধারণা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। এর পক্ষে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্বসূরি মুসলিমদের ইতিহাসে অগণিত প্রমাণ রয়েছে। প্রথমে পবিত্র কুরআনে কারিমের চিরসত্য সেই প্রমাণ পেশ করা হলো, যাতে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।'[২২]

ইসলাম সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছে। ইসলাম লাঞ্ছনা-অপদস্থতা থেকে উত্তরণের তরে আমরণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ জালিম-অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্যের বাণী উচ্চকিত করাকে সর্বোকৃষ্ট জিহাদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ হলো, স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্যের বাণী উচ্চকিত করা।'[২৩]

তারিক বিন শিহাব রহ. বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সওয়ারির রিকাবে পা রাখাকালীন জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কোন জিহাদ অধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।'[২৪]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَنَهَاهُ وَأَمَرَهُ، فَقَتَلَهُ

'কিয়ামতের দিন শহিদগণের সরদার হবেন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা., এবং সেই ব্যক্তি, যে কোনো স্বৈরাচার শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে (শরিয়তের) কোনো বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করেছে যাদ্দরুন শাসক তাকে হত্যা করেছে।'[২৫]

২২. সুরা আত-তাওবা : ১৪

২৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪/১২৪, হা. নং ৪৩৪৪ (আল-মাকাতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

২৪. মুসনাদু আহমাদ : ৩১/১২৬, হা. নং ১৮৮৩০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

২৫. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৪/২৩৮, হা. নং ৪০৭৯ (দারুল হারামাইন, কায়রো) ইমাম আবু হানিফা রহ. সূত্রে হাদিসটি সহিহ।

এটি হলো এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে, ইসলাম কোনো অন্যায়-অত্যাচার, লাঞ্ছনা-অপদস্থতা বা দুর্বলের ওপর সবলের জুলুম-নির্যাতন সমর্থন করেনি; বরং সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। ইসলাম এসব কিছু থেকে মানুষকে মুক্ত রেখেছে এবং অন্যদের মুক্ত করার সুন্দরতম নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

অতএব, ধর্মকে আফিম বা নেশা বলে আখ্যায়িত করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। আফিম, ইয়াবা, গাজা প্রভৃতির নেশা এমনই এক মহামারি, যাতে কেবল মার্ক্সবাদীরাই টিকে থাকতে পারে। হিংসা, ধোঁকা, প্রতারণা ও অন্ধবিশ্বাস এদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে এবং হৃদয়াত্মার শুষ্কতা, মনুষ্যত্বশূন্যতা ও চরিত্রহীনতা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

সব উন্নতির মাধ্যম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সাম্যবাদীদের দৃষ্টিতে অর্থনীতিই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি, যার ওপর ভর করেই মানুষের জীবন ও সমাজ গড়ে ওঠে। সুতরাং যেকোনো ধরনের উন্নতি, অগ্রগতি, প্রভাব ও পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে, উৎপাদনের উপকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

তাদের এমন চিন্তাধারা নিরর্থক প্রলাপ বৈ কিছু নয়। যার সামান্যতম চেতনা ও অনুভূতি আছে, সেও এমন চিন্তাধারা গ্রহণ করবে না। তাই এ ধরনের বাস্তবতাবিবর্জিত নীতি নবি-রাসুল ও সালাফে সালিহিনের দিকে সম্বোধিত করা বস্তুত তাঁদের মান ক্ষুণ্ন করারই নামান্তর। যাঁদের কথা ও চিন্তা-গবেষণায় মানুষের কর্ম ও বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি আসে, যাঁদের আদর্শ বাস্তবায়নে ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায় এবং যাঁদের অনুসরণে সমাজের পাপ-পঙ্কিলতা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাদের থেকে কখনো এমন অজ্ঞতাপূর্ণ বাণী বা নীতি প্রকাশের কল্পনাও করা যায় না।

অতএব, কমিউনিজমভিত্তিক অর্থনীতিকে নবি-রাসুল, সালাফে সালিহিন ও উম্মাহর বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ হচ্ছে তাঁদের অপমান করা এবং ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাকে তুচ্ছ করা। তা ছাড়াও তাদের এটি মারাত্মক একটি ভুল চিন্তা যে, অর্থনীতিই মানুষের অগ্রগতি, উন্নতি ও পরিবর্তনের মূলভিত্তি ও উপাদান। বস্তুত বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও সঠিক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমেই মানুষের জীবনে পরিবর্তন, উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়ে থাকে।

মানুষের মন ও মস্তিষ্কের গভীর থেকেই আকিদা বা বিশ্বাসের উৎপত্তি। আর মানুষ তার ভেতরে বদ্ধমূল আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কোনো কিছুর প্রতি ধাবিত হয়। অন্তরে থাকা সে আকিদাই মানুষকে কোনো কাজ করা বা না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, মানবজীবনে অর্থের ভূমিকা শুধু এতটুকুই যে, মানুষ এর দ্বারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু এটা কখনোই একজন মানুষের উন্নতি, অগ্রগতি বা আমূল পরিবর্তনের মূলভিত্তি হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত নিরক্ষর এক জাতির মাঝে। অতঃপর অর্থের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই তা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলাম স্বমহিমায় নিজ গতিতেই বিস্তৃতি লাভ করেছে। কখনো অর্থনীতির উন্নতির ওপর নির্ভর করেনি; বরং ইসলামের যত উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা কেবল ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস হৃদয়ে গেঁথে নেওয়ার কারণেই হয়েছে। ফলে ইসলামই মুসলমানদের যেকোনো কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং বুঝা গেল, মানুষের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা কোনো কিছুর প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া অর্থনীতির প্রভাবে হয় না; বরং তা কেবল তাদের আকিদা বা বিশ্বাসের কারণেই হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছুই নেই

ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা। ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারে কার্ল মার্ক্সের ধারণা ছিল নিতান্তই ভুল। তার ধারণামতে, এটি হচ্ছে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ছিনতাই-লুণ্ঠন ও জুলুম-নির্যাতনের প্রাথমিক স্তর। তাই ব্যক্তি মালিকানার পরিধি যত বড় বা ছোটই হোক না কেন, সাম্যবাদী দৃষ্টিতে তা নিন্দনীয়। তারা মনে করে যে, মানুষকে যেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও পোশাকাদি রাষ্ট্র জোগান দিয়ে থাকে, তাদের সেই পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় না। অতএব, জনগণের পরিবর্তে সকল সম্পত্তির অধিকারী হবে একমাত্র রাষ্ট্র। তাতে কারও সামান্যতম মালিকানাও থাকবে না। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাদের এমন মতবাদ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা ও আগ্রহের পরিপন্থী; অথচ মানুষ সৃষ্টিগত ও বস্তুগতভাবেই ব্যক্তি মালিকানার প্রতি আগ্রহী হয়। প্রত্যেকেই স্ত্রী, ছেলে-সন্তান নিয়ে জীবনযাপন করে। তাই সকলেই চায় প্রয়োজন পূরণের জন্য তার

কিছু সম্পত্তি থাকুক। কমিউনিজমের এমন অযৌক্তিক নীতি মানুষকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মালিকানা থেকে জোরপূর্বক বঞ্চিত করেছে। আর মানুষের সাথে এমন অসংগতিপূর্ণ আচরণ স্বয়ং মানুষ ও দেশের জন্য তাদের অবদানের ওপর অশুভ পরিণতি বয়ে আনবে এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের নীতি মানুষের উদ্যমতাকে নষ্ট করে দেয়, ইচ্ছাশক্তিকে নির্বাপিত করে দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্তির সময় পরিলক্ষিত হয়েছে, যার মালিকানায় ৩০% ভূমি ছিল, তাকে ৭০% ভূমির মালিকের মতোই ফসলের কর দিতে হতো। মূলত এই জমিগুলোর মালিক ছিল রাষ্ট্র। জনগণকে তা চাষাবাদ করার জন্য দেওয়া হতো। এর পতনের মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ কারণ এটিও। যেমনিভাবে এর প্রথম কারণ ছিল ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা।

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির মালিক হবে—এটিই হলো বাস্তবতা এবং মানুষের অপরিবর্তনীয় ফিতরাত বা স্বভাবজাত চাহিদা, যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র অজ্ঞ ও অত্যাচারীরাই এটিকে অস্বীকার করতে পারে। অতএব, মানুষের ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা শেষ পর্যন্ত দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে ছাড়ে। ফলে অন্যান্য দেশের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরপাক খেতে হয়; যেমনটা করছে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন। অথচ এই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এক সময়ের সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী, উৎপাদনশীল, বিস্তৃত ও পানিসমৃদ্ধ দেশ। সমাজতন্ত্রের আগমনের পূর্বে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপাদনকারী রাষ্ট্র। কিন্তু আজ তা সমাজতন্ত্রের প্রভাবে ভিক্ষুকপ্রায় এবং আমেরিকা কানাডাসহ আরও বহু দেশ থেকে তারা এখন পণ্য আমদানি করে; অথচ তারা ছিল একসময়ের রপ্তানিকারক।

শ্রেণি বিভাজনের মূলোৎপাটন

শ্রেণি সংগ্রাম। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে এই প্রজ্বলিত দ্বন্দ্বের পদ্ধতি কার্ল মার্ক্সের দেওয়া নোংরা ধারণাপ্রসূত। খেয়াল-খুশিপূর্ণ মতবাদ ও বাস্তবিক কার্যকরী মতবাদের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশের দিকে লক্ষ করলেও কার্ল মার্ক্সের এমন নিরর্থক নিয়মনীতি চোখে পড়বে না। মার্ক্স ও তার অনুসারীদের নিকট মানুষ শৃঙ্খলিত ও বশীভূত কর্মী মাত্র, যাকে প্রয়োজন হলে নির্যাতন বা বঞ্চিত করা যায় এবং তার ওপর আক্রমণ করার জন্য এবং তাকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য যেকোনো সুযোগই গ্রহণ করা যায়।

অপরদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের লক্ষ্যে, তাকে খুশি ও নিশ্চিন্ত করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ কাজ করে থাকে। যদিও পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হলো, অন্যান্য জনগোষ্ঠির কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করা, বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা এবং আমাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন করা। অর্থাৎ পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার সাথে ইসলামের এত অমিল থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকের অধিকারের বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা কিছুটা উন্নত। অথচ একই বিষয়ে কমিউনিস্টদের বাস্তব কর্ম তুলনামূলক অনেক ভয়ংকর।

পুঁজিবাদীরা গণতন্ত্রের মিথ্যা বুলিকে আশ্রয় করে শাসন চালায়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের মিথ্যা বুলিরও নাম-নিশানা থাকে না; বরং সেখানে চালু হয় একনায়কতন্ত্র, যা আরও ভয়ংকর, আরও বিভীষিকাময়। সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের ধ্বজাধারীরা গণতন্ত্র উচ্ছেদের ডাক দিয়ে 'জালিমশাহি নিপাত যাক' স্লোগান দিয়ে, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' আওয়াজ তুলে রক্তপাত, শঠতা ও ধূর্ততার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েই তাদের বোল পাল্টে ফেলে। সর্বহারাদের নামে দখল করা ক্ষমতায় আর কেউ যেন ভাগ না বসাতে পারে সে জন্য একদিকে যেমন চালু হয় একদলীয় শাসনব্যবস্থা, তেমনই অন্যদিকে বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য চালানো হয় সাঁড়াশি অভিযান। এখানে শ্রমিকদের রক্তের ওপর গড়া শাসনব্যবস্থা কুক্ষিগত থাকে কতিপয় বুর্জোয়া ব্যক্তিদের হাতে। পৃথিবীর কোনো সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দেশে এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। শ্রেণিহীন এক স্বপ্নরাজ্যের স্থলে গড়ে ওঠে শ্রেণি বৈষম্যপূর্ণ এক নির্যাতন ও অত্যাচারের রাজত্ব।

মার্ক্স শ্রমিকদের ওপর সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে। তারা পোল্যান্ডে স্বয়ং সমাজতন্ত্রের ওপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল। যদি তাদের ও সন্ত্রাসীদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হতো, তাহলে তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের নীতিকে পরিবর্তন করে দিত এবং তাদের সেসব নেতাদের নির্মূল করে ছাড়ত, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শক্তিমত্তা ও অস্ত্রবলে তাদের ভয় দেখাত। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং মার্ক্সবাদী শাসক-বিচারকদের মিথ্যা ও ভ্রান্তির একটি উত্তম নমুনা এটি। যারা জনগণের উপেক্ষার স্বীকার হয়েছে এবং তাদের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে।

তবুও এই সমাজতন্ত্রের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের জন্য শ্রমিকরা এই পর্যন্ত বহুবার আন্দোলন করেছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬৮ সালে হাঙেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে যেমনটি ঘটেছিল। কিন্তু শাসকদের নির্দয়-নিষ্ঠুর আচরণ এবং হত্যা ও নির্যাতনের মুখে সেই আন্দোলনগুলো বারবারই সফলতার মুখ দেখতে পায়নি।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্য

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে।

২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ (সুদ, ব্যক্তিমালিকানা, বাজারব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি)।

৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ।

৪. পার্টির এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক।

৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ গোঁজামিলের দর্শনকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত।

৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির সৃষ্টি।

৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ।

৮. পুঁজিবাদের সাথে সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ।

৯. ইসলামের মোকাবিলায় পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।[২৬]

মোটকথা পৃথিবীতে মানবরচিত যত ব্যবস্থা রয়েছে সবগুলোই মানুষের কল্যাণ অথবা মানবতার মুক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সকল ব্যবস্থাই মানবজাতিকে ধ্বংসের ধারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। মানবজাতির জন্য উপকারী চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষকে অকল্যাণ ও মন্দ থেকে রক্ষা ও সকল প্রকার ব্যাধি থেকে বাঁচাতে তো পারেইনি, উপরন্তু তাদের জাহান্নামের কিনারে পৌঁছে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ, উভয় ব্যবস্থাই মানুষকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংকট। এগুলো হলো এমন সংকট, যা দিন দিন, বছরকে বছর অবিরামভাবে বেড়েই চলছে।

সমাজতন্ত্র সফল হয়নি; বরং মানবতার মুক্তি দিতে গিয়ে চরমভাবে বিফল হয়েছে। কেননা, তা মানুষের জমানো সম্পদকে ওয়াকফে পরিণত করার একটি পন্থা। তারপর মানুষকে দমন, পীড়ন, মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণের হাতিয়ার, যা কেবল দমন, আক্রমণ ও হিংস্রাত্মক জুলুমেরই প্রসার ঘটিয়েছে।

পুঁজিবাদও সফলতা পায়নি; বরং সেটাও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তা মানুষকে আত্মিক ও ব্যষ্টিকরূপে বিনাশ করে দিয়েছে। এ ব্যবস্থা কিছু স্বার্থবাজের স্বাচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। একবাক্যে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র মানুষকে দমন ও নিঃস্ব করেছে। আর পুঁজিবাদ মানুষকে কলুষিত করেছে, ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। দুটোই মানুষকে নীচতা, হীনতা, ক্ষতিগ্রস্থতা ও বিনাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

অবিরামভাবে মানুষ সংকট ও ধ্বংসের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। আর এভাবেই চলতে থাকবে যদি মানুষ অবক্ষয় ও অধঃপতনের এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আল্লাহর আদেশের দিকে, ইসলামের পথে ফিরে না আসে। ইসলামই হলো সমাধানের একমাত্র পথ। সকল সমস্যা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি। মানুষের চারপাশে থাকা সংকট থেকে বের করার, মানুষকে ঘিরে থাকা দুর্ভাগ্য থেকে ফিরিয়ে আনার একমাত্র ও একক পন্থা। ইসলামেই রয়েছে মানবতার নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি আনয়ন এবং এ ধরায় শান্তি ও ভালোবাসা ফেরানোর একমাত্র উপায়। ইসলাম ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ ও পদ্ধতি খোলা নেই।

---

২৬. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কৃত 'ইসলামি অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ' ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র।

গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার আকিদা বা বিশ্বাস হলো, ধর্ম ব্যক্তিজীবনে এবং ইবাদতখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের নিজস্ব মতামত দিয়ে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে ইসলামি জীবনব্যবস্থার আকিদা হলো, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। জীবন ও রাষ্ট্র সকল কিছুই সে ব্যবস্থানুপাতে পরিচালিত হবে। আল্লাহর হুকুম কেবল ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতন্ত্রের সূচনাকাল

খ্রিষ্ট সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে যেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যেতে হয়, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপবাসীদেরকেও তেমনই জ্ঞানের তালাশে মুসলিম অধ্যুষিত ঐতিহ্যবাহী আন্দালুসের (আন্দালুসের বর্তমান নাম স্পেন) আল-হামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় ভিড় জমাতে হতো। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল। সে সময় ইউরোপে খ্রিষ্টান পাদরিদের শাসন চলছিল। ইউরোপের পাদরি শাসকরা শোষণ ও নির্যাতন করার হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করত। পাদরিরা ধর্মের নামে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব করছিল। তারা নিজেদের আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করত। তারা দাবি করত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও তা তত্ত্বাবধায়ন করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন নতুন জ্ঞানচর্চার উন্মেষ ঘটে, মানুষ অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে আলোর দিকে আসতে শুরু করে, তখন তাদের নিকট পাদরিদের মনগড়া মতামত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে থাকে। এখান থেকেই তাদের সাথে জনগণের সংঘাত শুরু হয়। পাদরিরা আর কোনো উপায় না পেয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল। ধর্মের নামে পাদরিদের এ অধার্মিক আচরণ জনগণের মনে তীব্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করল। এরপর সাধারণ জনগণ জীবনের সকল বিভাগ থেকে পাদরিদের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হওয়া শুরু করল। ষোড়শ ও সপ্তদশ দীর্ঘ দুশতাব্দী ধরে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। ইতিহাসে এ সংগ্রামযুদ্ধ 'গির্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই' নামে পরিচিত। এ সংঘাতের সমাধানের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল নাস্তিক আর অন্যান্য কিছু লোক সরাসরি ধর্মকে অস্বীকার না করলেও রাষ্ট্রের মাঝে ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করল। এভাবে তারা সকলে ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে ফেলার সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করল। তাদের মতে ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত একটি বিষয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মকে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। তারা শাসনব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করল এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে একটি আপস রফায় উপনীত হলো। এ আপসের প্রস্তাবে বলা হলো, 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং মানুষের ধর্মীয় দিকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাদরিদের হাতে থাকবে। আর জনগণকে শাসন করার কর্তৃত্ব থাকবে জনগণের হাতে। তাদের ওপর আর কারও কর্তৃত্ব থাকবে না। জনগণই আইন প্রণয়ন করবে এবং এ আইন দ্বারাই তারা শাসিত হবে। তারা যে বিধান রচনা করবে, তদ্দারা পরিচালনার জন্য নিজেরাই নিজেদের শাসক নিযুক্ত করবে। অবশ্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে পাদরিদের হাতেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবার শপথ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে জনগণকে পাদরিদের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মানবরচিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে মানবরচিত একটি শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমা সভ্যতার এ বিশ্বাসের ফলে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে ফেলা হলো। ধর্ম সঠিক কিনা, তা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না; বরং তারা ধর্মকে সমস্যা মনে করে তাদের জীবন থেকেই তা সরিয়ে দিয়েছে। আর এখান থেকেই সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি হয়।

আজ যারা সেক্যুলারিজমের কথা বলে তাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিষ্টান ধর্মের পাদরিদের সাথে জনগণের সৃষ্ট সমস্যা থেকে এসেছে, ইসলামের সৃষ্ট কোনো সমস্যা থেকে এর উৎপত্তি ঘটেনি। তারপরও তা জোর করেই মুসলমানদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টান পাদরিরা ধর্মের নামে অন্যায় আচরণ ও মনগড়া নীতি প্রচার করত। আর তাই প্রকৃতপক্ষে জনগণের এ সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না; মৌলিকভাবে তা ছিল পাদরিদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাদরিদের মোকাবেলা

করতে গিয়ে তারা জীবন থেকে ধর্মকে পরিত্যাগ করে বসল। যাকে বলে মাথাব্যথা দূর করার জন্য মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ। এ গণতান্ত্রিক মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বটে, তবে তাদের মতে দুনিয়ার জীবনে উন্নতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা নবি-রাসুলের কোনোই প্রয়োজন নেই। তারা ব্যক্তিগত জীবনে ঐচ্ছিকভাবে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সমাজ জীবনে আল্লাহকে অস্বীকার করার সুবিধা সংবলিত মতবাদ তৈরি করে নিল। ফলে মানবসমাজের জন্য আল্লাহ তাআলাকে বিধানদাতা হিসাবে অস্বীকার করা হলো। এ বিশ্বের সকল কিছু যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তাই সে মহাশক্তিশালী স্রষ্টার বিধানকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ না করা ও এতে বাধা দেওয়া সরাসরি আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার শামিল। আল্লাহ তাআলাকে যদি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে মান্য করা না-ই যায়, তাহলে কেবল ব্যক্তিজীবনে তাঁর ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। আফসোসের বিষয় হলো, মুসলমানরা আজ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে পশ্চিমা প্রভুদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্মা বিক্রি করে বিশ্বস্ত গোলামের মতো তাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

আভিধানিক অর্থ :

গণতন্ত্রের ইংরেজি Democracy শব্দটি মূলত গ্রীকভাষায় Demos এবং kratía শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। Demos অর্থ জনগণ আর kratía অর্থ শাসন। তাহলে Democracy এর অর্থ হলো, জনগণের শাসন।

পারিভাষিক অর্থ :

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে :

> Democratic System of Government : A system of government based on the principle of majority dicision-making.

‘সরকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি : সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণের নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারব্যবস্থা।’[২৭]

আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে :

Government of the people, by the people, for the people.

‘জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।’[২৮]

উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্রের বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে :

> ‘গণতন্ত্র বলতে কোনো জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনো সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে।
>
> গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে।’[২৯]

সুতরাং গণতন্ত্র বলতে জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমিক ক্ষমতার মধ্যে আইন রচনা করে। এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ন ও শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে।

জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান ও আইন প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই বলা যায়,

---

২৭. Encarta 2009 Encyclopedia Britannica 2012
২৮. President Abraham Lincoln, The Gettysburg Address (Nov.19,1863)
২৯. https://bn.wikipedia.org/wiki/গণতন্ত্র

জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। আর জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইসলাম এ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামি আকিদার ভিত্তি হচ্ছে, দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলার আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে এবং আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। এর বিপরীত গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি ব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধিবিধান নাজিল করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আল্লাহর বিধিবিধানকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটি মূলত আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারীদের ব্যবস্থা বা এককথায় কুফরি ব্যবস্থা। তাই তাদের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না; বরং সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ সকল কিছুকে বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

'তারা বিচার-ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্য তাদের আদেশ করা হয়েছে।'[৩০]

যে আকিদা থেকে এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যে ভিত্তির ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত এবং যে চিন্তা-ধারণার সে জন্ম দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের আকিদা বা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

গণতন্ত্রের আকিদা থেকে নিম্নোক্ত দুটি ধারণার উদ্ভব হয় :

১. সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য।

২. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

উপরিউক্ত দুটি ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তাদের ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। এর দ্বারা পাদরিদের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে জনগণের হাতে তা সমর্পণ করা হয়। পোপদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফসল হিসাবে ধর্মীয় আইন-কানুনের অবসান করা হয়। ফলে সার্বভৌমত্ব হলো জনগণের জন্য এবং জনগণই হলো সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দুটি ধারণাই বাস্তবায়ন করা হলো। ফলে জনগণই হয়ে গেলো সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামে সার্বভৌমিক ক্ষমতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় বাহ্যিকভাবে এক মনে হলেও বাস্তবে এই দুটি দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনাপনি বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয় ইসলাম থাকবে; নচেৎ গণতন্ত্র।

৩০. সুরা আন-নিসা : ৬০

শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ থেকে বোঝা গেলো যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থ, মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রণীত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা। আর এটা সুস্পষ্ট কুফর। শরিয়তের দলিল—কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস সবকিছুর দ্বারা এর কুফরি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে পর্যায়ক্রমে দলিলসমূহ পেশ করা হলো।

কুরআন থেকে দলিল :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তাআলার-ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[৩১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সেসব লোকই কাফির।'[৩২]

হাদিস থেকে দলিল :

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন :

يَكُوْنُ فِيْ أَخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَحْضُرُوْنَ السُّلْطَانَ فَيَحْكُمُوْنَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللّٰهِ وَلَا يَنْهَوْنَ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ.

'শেষ যুগে একটি জাতি আসবে, যারা এমন শাসকের কাছে যাতায়াত করবে, যারা আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার ও শাসন করবে। তারা সে শাসককে এ থেকে বাধা দেবে না। তাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।'[৩৩]

মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ.

'...সাবধান! অচিরেই এমন কিছু শাসক আসবে, যারা তোমাদের ওপর বিচারকার্য পরিচালনা করবে। তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করো, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করবে।'[৩৪]

---

৩১. সুরা ইউসুফ : ৪০
৩২. সুরা আল-মায়িদা : ৪৪
৩৩. আল-ফিরদাউস বি-মাসুরিল খিতাব (দাইলামি) : ৫/৪৫৫, হা. নং ৮৭২৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৩৪. আল-মুজামুস সগির, তাবারানি : হা. নং ৭৪৯ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

ইজমা থেকে দলিল :

উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম গণতন্ত্র কুফরি হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিখ্যাত ইমাম ও মুফাসসির আল্লামা জাসসাস রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।'[৩৫]

ইমাম জাসসাস রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ. وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ; لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

'এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসুল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক এবং মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদের বন্দী করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর বিচার ও বিধানকে মেনে নেবে না, সে ইমানদার নয়।'[৩৬]

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান মেনে না নেওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ উক্ত ব্যক্তিদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাসসাস রহ.-এর ভাষ্যমতে 'যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।' অতএব যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়ে এ স্লোগান প্রচার করছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এবং আল্লাহপ্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে—এসব পদ্ধতি কি স্পষ্ট কুফর নয়?!

কিয়াস থেকে দলিল :

সকলের জানা, রাসুল ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর রা. খিলাফতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন একদল লোক জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানাল। তাদের নিকট কারণ দর্শানোর আদেশ করা হলে তারা কুরআনের এ আয়াত থেকে দলিল পেশ করল, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 'আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা (জাকাত) গ্রহণ করুন।' [সুরা আত-তাওবা : ১০৩] তারা যুক্তি পেশ করে বলল, এখানে জাকাত আদায়ের আদেশ রাসুল ﷺ-কে সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন তো রাসুল ﷺ নেই, তাই আমরা জাকাত দেবো না। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র জিহাদ করে তাদের মাল-সম্পদ গনিমত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করেন। ইমাম জাসসাস রহ., ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ., কাজি আবু ইয়ালা রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-সহ অসংখ্য ফকিহ ও মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদের মুরতাদ আখ্যায়িত করেই তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। অনেক ফকিহ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর ইজমা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে

---

৩৫. সুরা আন-নিসা : ৬৫

৩৬. আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ২/২৬৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

কিরাম রা.-এর যুদ্ধের ধরনও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদের পরিবার-পরিজনকে যুদ্ধবন্দী করেছিলেন। তারা কালিমা পাঠ করত, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত। নামাজ, রোজা, হজ, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য সকল বিধানও পালন করত। কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে সাহাবায়ে কিরাম রা. সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং দ্বীনের একটি মাত্র বিধানকে অমান্য করলে যেখানে মানুষের ইমান থাকে না, তাহলে যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়েছে এবং স্লোগান তুলছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার', শুধু তাই-ই নয়; বরং নিজেদের স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াত থেকে দলিলও পেশ করছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই' [সূরা বাকারা : ২৫৬]; একটি নয় দুটি নয়, আল্লাহর শত শত বিধানকে অমান্য করা হচ্ছে; শুধু অমান্য করছে এমনটি নয়, বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় সবকিছু করেও দাবি করছে, মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলছে; যে ক্ষমতায় যায় সেই বলছে, আমরা কুরআন সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করিনি, করব না; অথচ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী অসংখ্য আইন বিদ্যমান রয়েছে। যদি একটি বিধান প্রত্যাখ্যানের কারণে মুরতাদ হয়, তাহলে এত অসংখ্য বিধান অমান্য ও নিষিদ্ধ করার পরও কি এ গণতন্ত্র কুফরি না হয়ে থাকতে পারে?!

সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি হকের মানদণ্ড?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ই হচ্ছে সকল সিদ্ধান্তের মানদণ্ড। এ ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই সকল জনগণের মত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আইন প্রণয়ন করা, প্রতিনিধি নির্বাচন করা, সরকারের অবস্থা যাচাই করাসহ সকল ক্ষেত্রেই যেদিকে বেশি ভোট পড়ে, সেটিই সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অশিক্ষিত লোকদের মতামত সব এক পাল্লায় মাপা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলার হালাল বিধানকে হারাম আর হারাম বিধানকে হালাল করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে যদি দুনিয়ার সকল মানুষও একত্রিত হয়ে কোনো হারাম কাজের পক্ষে মতামত দেয়, তাহলেও তা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অপব্যবহার

পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ধর্ম থেকে তাদের জীবনকে আলাদা করে ফেলল, তখন সে তার নিজের সিদ্ধান্তকে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের সিদ্ধান্তের মূল চালিকাশক্তি হয়ে গেল লাভ-লোকসান। তারা ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ কোনো কিছু করা বা না করা, সকল কিছু নির্ধারণ করতে লাগল লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। এভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে নিম্নোক্ত চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে।

ক. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

খ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

গ. মালিকানার স্বাধীনতা

ঘ. ব্যক্তি স্বাধীনতা

বিশ্বাসের স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার আওতায় কোনো মানুষ যেকোনো কিছুকে আকিদা বা বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। যেকোনো কিছুর ওপর ইমান আনতে পারে কিংবা যেকোনো বিশ্বাস প্রত্যাহারও করতে পারে। একজন মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করতেও পারে আবার ইচ্ছে করলে না-ও করতে পারে। অনুরূপ একইসাথে একজন মানুষ নামাজ পড়তে পারে, আবার মূর্তিপূজাও করতে পারে। এ হচ্ছে তার বিশ্বাসের স্বাধীনতা। আজকাল গণতন্ত্র চর্চার ফলে আমাদের সমাজে এ প্রভাব স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন অনেক মুসলমান যুবক কদরের রাত্রিতে রাত জেগে ইবাদত করে আবার পহেলা বৈশাখে মঙ্গল প্রদীপের নামে অগ্নিপূজাও করে। একইভাবে তারা যেমন ইদের নামাজে দলবেঁধে শামিল হয়, তেমনই দুর্গাপূজাকে সর্বজনীন বলে তাতেও অংশগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। যেমন আমাদের দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ এক নেতা বিগত ১৩ জুলাই ২০১১ এক অনুষ্ঠানে বলেছিল, 'আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই।' সে গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থাকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে বলেই তার আকিদার স্বাধীনতা থেকে এ কথাগুলো বলতে পেরেছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় যে কেউ-ই তার আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি যে সকল চিন্তা-চেতনা ধারণ করে, তা সে প্রকাশ করার অধিকার রাখে এবং এ মতের দিকে অন্যদেরকেও আহ্বান করতে পারে। এ ব্যাপারে সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রায়শই অন্য মতামত বা ব্যক্তি আক্রমণ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে নানা অপকর্ম করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় বংশদ্ভুত সালমান রুশদি satanic verses লিখে ইসলামকে আক্রমণ করেছিল এবং এটাকে তার মত প্রকাশের অধিকার বলে চালিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোও জিগির তুলেছিল যে, সে তার মতামত প্রকাশের অধিকার রাখে। একইভাবে ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট এবং আমাদের দেশের প্রথম আলো পত্রিকা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করে এটাকে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে প্রচার করেছিল। এভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মূলত ভিন্নমত বা বিশ্বাসকে আক্রমণ করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে, মুসলমানদের সকল মতামত শরিয়ার আলোকে হতে হবে। ইসলামি শরিয়া অনুমোদন করে না—এমন কোনো মতামত বা বক্তব্য মুসলমানরা প্রদান করতে পারবে না। কেউ যদি সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মালিকানার স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা আছে এবং এর মূল বিশ্বাসই হচ্ছে, যেকোনো উপায়ে অধিক পরিমাণ লাভ পাওয়া, তাই এ ব্যবস্থায় কেউ ইচ্ছা করলে প্রচুর পরিমাণ পণ্য মজুদ করে পণ্যের দাম বাড়িয়েও ব্যবসা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে, সে কোনো অপরাধী নয় ।

পক্ষান্তরে ইসলাম জনগণের ভোগান্তি হতে পারে—এরকম সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। কেউ এরকম কোনো কাজ করলে রাষ্ট্র তাকে প্রতিহত করবে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা কোনো ব্যক্তিকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ থেকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি হচ্ছে মুখ্য। এ স্বাধীনতার ফলে সে যেভাবে জীবনের চাহিদা মেটাতে পছন্দ করে, সেভাবে তা উপভোগ করবে এবং সেখান থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যে অধঃপতিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এবারে তার গুটিকয়েক নমুনা তুলে ধরা যাক।

এক. অবাধ যৌনাচার

ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যৌনাচারের বিস্তার লাভ করেছে। কিশোর-কিশোরীরা যথেচ্ছা যৌনাচারে লিপ্ত হলেও মা-বাবারও কিছু করার থাকে না। কারণ, এ অধিকারটি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় পড়ে। পশ্চিমা দেশের রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, বাসে, অনুষ্ঠানে, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের জড়াজড়ি, আলিঙ্গন ও চুম্বন মহড়া কারও দৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। তারা নগ্ন হয়ে চলাফেরা করতে পারে, মাতাল হতে পারে, অনেক নারী-পুরুষ একত্রে একই স্থানে একই সময়ে যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে, যা বনের জীব-জানোয়ারকেও হার মানায়। অস্ট্রেলিয়াতে এক বাবা তার মেয়েকে সাত বছর আটকে রেখে জিনা করেছে, যা অনেকেই মিডিয়াতে লক্ষ করেছেন। এটা হলো তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না; এমনকি তারা আত্মীয়-স্বজন মা ও বোনের সাথে পর্যন্ত যৌনাচার করে থাকে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

পক্ষান্তরে ইসলামি জীবনব্যবস্থায় মানুষ কীভাবে তাদের যৌন চাহিদা মেটাবে, তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ইসলাম মিলনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল বিবাহব্যবস্থা প্রদান করেছে। বিবাহ বহির্ভূত কোনো নারী বা পুরুষ অন্যের সাথে মিলিত হতে পারবে না। এ শৃঙ্খলা রক্ষায় ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান আরোপ করেছে।

দুই. সমকামিতা

যেহেতু গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে, তাই পশ্চিমা পার্লামেন্ট আজ তাদের বিকৃত চাহিদা মেটানোর জন্য সমকামী বিবাহের বৈধতা দান করেছে। আর এটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়েছে। এমনকি আজ পশ্চিমা সমাজ বর্বরতার এমন স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, তারা কুকুর, বিড়াল ও বিভিন্ন পশুর সাথে জিনা করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম এই গর্হিত কাজকে চরমভাবে ঘৃণা করে। এমনকি শরিয়া তার জন্য যথাযথ ও কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে। পূর্ববর্তী একটি জাতিকেও আল্লাহ তাআলা শুধু এ জঘন্য অপরাধের কারণেই ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তিন. লিভ টুগেদার

পশ্চিমা ব্যবস্থায় আজ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে চলছে লিভ টুগেদারের রমরমা প্রচলন। পবিত্র বিবাহব্যবস্থাকে ঝামেলাপূর্ণ মনে করে অনেক মানুষ এখন বিবাহ ছাড়াই এক ছাদের নিচে রাত কাটাচ্ছে। যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রত্যেকে যার পথ সে বেছে নিচ্ছে। এভাবে বৈবাহিক জীবনকে তাদের সমাজব্যবস্থা থেকে ছুঁড়ে ফেলায় তাদের বার্ধক্যে কোথাও ঠাঁই মিলছে না। একপর্যায়ে হতাশায় কেউ আত্মহত্যা করছে, কেউ ইউগার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে আর কেউ বা পথে পথে ঠোকর খেয়ে ফিরছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌন সম্পর্ককে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। এর জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। শরিয়ায় বিভিন্নভাবে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর তাই আজও মুসলিম সমাজকে এ ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত এটা ব্যাপকভাবে মুসলিমদের কলুষিত করতে পারেনি।

ফিরাউনি ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ

এ বিষয়টি আজ উপলব্ধি করা বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে যে, ফিরাউন একজন রাষ্ট্রপ্রধান ছিল। সে নিজেও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করত। কিন্তু সে নিজের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব দাবি করার ফলে রব সেজে বসল। কুরআনের মাধ্যমে ফিরাউনের কাহিনী আমাদের নিকট পেশ করার কারণ হলো, আমরা যেন এমন কোনো রাজা-বাদশাকে বা এমন কোনো ব্যবস্থাপনাকে না মানি, যারা সার্বভৌমত্বের দাবি করে বসে। আমরা যেন ফিরাউনের মতো কোনো শাসককে মেনে শিরকে নিপতিত না হয়ে যাই। কারণ, আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্য কারও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার মানেই হচ্ছে, তাকে রব বলে স্বীকার করে নেওয়া। যদি ফিরাউনকে মানলে শিরক হয়, তাহলে এ গণতন্ত্র মানলেও শিরক হবে। মুসলমানেরা এসব নব্য ফিরাউনদের অনুসরণ করে যাতে আবার শিরকের মধ্যে হাবুডুবু না খায়, তা থেকে সর্তক করার জন্যই আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের কাহিনী আমাদের কাছে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আজ গণতন্ত্ররূপী নব্য ফিরাউনরা জনগণকে আল্লাহর মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করলে অনেকখানি-ই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. ইসলাম আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দান করেছি এবং ধর্ম হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করেছি।’[৩৭]

৩৭. সুরা আল-মায়িদা : ৩

২. ইসলামি শরিয়তে সর্ব বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই হলো সকল ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।'[৩৮]

৩. ইসলামে আইনের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আইনের উৎস হলো অধিকাংশ মানুষের বিবেকপ্রসূত রায় ও মতামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।'[৩৯]

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানানুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির, তারাই জালিম, তারাই ফাসিক। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে, কোর্ট-কাচারিতে দেশের সাংবিধানিক আইন চলে, আল্লাহর বিচারব্যবস্থা চলতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।[৪০]

৫. ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। আর গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ ভোগবাদ। সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে । আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৪১]

৬. ইসলামে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'আর তাদের কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। কাফিররা যেসব অংশীদার সাব্যস্ত করে, তিনি তা থেকে পূত-পবিত্র।'[৪২]

৩৮. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮
৩৯. সুরা ইউসুফ : ৪০
৪০. সুরা আল-মায়িদা : ৪৪
৪১. সহিহুল বুখারি : ১/১২, হা. নং ১৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৪২. সুরা আত-তাওবা : ৩১

ক্রুসেড

ক্রুসেড হলো খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। ক্রুসেড বলতে এমন আক্রমণ বোঝায়, যার উৎপত্তি সংকীর্ণমনা গোঁড়ামির ঘৃণ্যতা থেকে। যার ভিত্তি শিক্ষার আলোপ্রাপ্ত কোনো চিন্তাধারা থেকে নয় অথবা মানবতা রক্ষাকারী কোনো সম্মানার্হ্য বিশ্বাস থেকে নয়; বরং এর ভিত্তি হলো অন্ধ ও বধির গোঁড়ামি, যার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো ইসলাম ও মুসলিম।

ক্রুসেড কাকে বলে?

১০৯৫ থেকে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড, বিশেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্ব বহাল করার জন্য ইউরোপের খ্রিষ্টানরা অনেক যুদ্ধ করে। ইতিহাসে এগুলোকে ক্রুসেড যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ সংজ্ঞা আংশিক সত্য। কারণ, ক্রুসেড ও তার মনোভাব শুরু হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ও খিলাফতে রাশিদার সময় বাইজান্টাইনদের পরাজয়ের পটভূমিতে।

ক্রুসেড নামে নামকরণের কারণ

ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা পোপের নির্দেশে বুকে ক্রুসচিহ্ন নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ক্রুসকেই যুদ্ধের পতাকা হিসাবে ব্যবহার করেছিল বলে এ যুদ্ধ ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত।

ক্রুসেডের কারণ বিবৃতি

মূলত ক্রুসেড হলো, মুসলিমদের কাছে হেরে যাওয়ার ফলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসাপরায়ণতা, খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত ও উগ্র মন-মানসিকতার ফলাফল।

সচেতন পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী মাত্রই অবগত যে, খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা লালন করে আসছে ইসলামের উত্থানের দিন থেকেই। ক্রুসেডের মূলভিত্তি হলো, ইসলামের বিজয়ের সূচনাকাল থেকে লালন করা সে মনোভাব। বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে নেওয়া নিয়ে একাদশ শতকে তৈরি হওয়া কোনো বাস্তব সংঘাতের নাম মূল ক্রুসেড নয়; বরং ইসলামের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চলে আসছে এ ক্রুসেডের ধারাবাহিকতা। ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মাঝে চলমান সামরিক ও আদর্শিক দ্বন্দ্বই একসময় সর্বগ্রাসী যুদ্ধের রুপ ধারণ করে। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মৌলকভাবে কাজ করেছে নিম্নে সংক্ষেপে তাদের বিভিন্ন কালের কর্মপ্রক্রিয়া উল্লেখ করা হলো :

ক. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি, যা দেখে খ্রিষ্টানরা চাইছিল, মুসলিমদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আর এর ফলেই সংঘটিত হয় তাবুক যুদ্ধ।

খ. ইউরোপীয়দের মনে প্রতিশোধের আগুন ও ক্রুসেডীয় মনোভাব চাড়া দিয়ে উঠেছে, যখন রোমান খ্রিষ্টানরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে চরমভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। যে যুদ্ধের ফলে রোমান শাসন শাম ও এতদঅঞ্চল থেকে পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যায়।

গ. ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের হাতে চলে আসে। এটিও খ্রিষ্টানদের উগ্রপন্থাকে উসকে দেওয়ার অন্যতম কারণ। মূলত এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ও এটাকে পুঁজি বানিয়ে পোপ ও খ্রিষ্টান রাজারা সাধারণ খ্রিষ্টান জনগণকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকে দিতে থাকে।

ঘ. খ্রিষ্টবাদের এ গোঁড়ামির আগুন ফের প্রবল হয়ে ওঠে যখন সমগ্র ইউরোপ জোট ফিলিস্তিন ও শাম দেশে পরাজয় বরণ করে। যেদিন ইসলামের মহান সেনানায়ক সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর হাতে লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। যে হারের ফলে শাম ও বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্ব দূর হয়ে যায়। মুসলমানগণ পুনরায় শ্রদ্ধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আসনে সমাসীন হন।

ঙ. পরবর্তী সময় দীর্ঘকাল যাবৎ বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের দখলমুক্ত থাকে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে আরব জোটের সাথে ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হওয়ার পর ইসলামি ওয়াকফ ট্রাস্টের হাতে মসজিদের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। কাগজে-কলমে তা মুসলিমদের অধিকারে দেওয়া হলেও মূল কর্তৃত্ব ইহুদিদের হাতেই বহাল থাকে।

একাদশ শতকে ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ

ক. ধর্মীয় কারণ

ফিলিস্তিন ইসা ﷺ-এর জন্মস্থান। ফলে খ্রিষ্টানদের জন্য তা পবিত্র ও বরকতময় একটি স্থান। তাদের জন্য এটি ছিল পর্যটনের স্থান। উমর রা.-এর খিলাফতকালে ফিলিস্তিন ভূমি ও বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। তখন থেকেই খ্রিষ্টানরা তা পুনর্দখল করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

খ. অমুসলিম দর্শনার্থীদের কটু আচরণ

যেহেতু মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান—তিন ধর্মের লোকদের জন্যই এ স্থানটি পবিত্র, তাই অমুসলিমরা যখন বাইতুল মুকাদ্দাস দর্শনের উদ্দেশ্যে এখানে আসত, তখন মুসলমান প্রশাসন তাদের সুযোগ করে দিত। অমুসলিমদের গির্জা ও খানকাগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রশাসন তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলামি খিলাফতের দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার যুগে এসব পর্যটক স্বাধীনতার এ সুযোগকে নিয়ে অপচেষ্টা চালায়। তাদের উদ্দেশ্যমূলক আচরণের কারণে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছোটখাট দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু এই ফিতনাকারীরা দেশে ফিরে মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের বানোয়াট কাহিনী প্রচার করে ইউরোপবাসীকে উসকে দিতে শুরু করে। ইউরোপের খ্রিষ্টানরা তো আগে থেকেই মুসলমানদের বিরোধী ছিল। এখন এ পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। তাই খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ইউরোপের ইতালি, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ডসহ অনেক খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড পুনরায়াত্ত করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে এটাকে আবার খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়।

গ. ইসা ﷺ-কে নিয়ে গুজব রটনা

এ সময় গোটা ইউরোপে একটি সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, ইসা ﷺ আবার নেমে এসে খ্রিষ্টানদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। কিন্তু তাঁর অবতরণ হবে তখন, যখন জেরুজালেমের পবিত্র শহর মুসলমানদের হাত থেকে স্বাধীন করা হবে।[৪৩] এই সংবাদ খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উত্তেজনা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। এটা ছিল অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার নামান্তর।

ঘ. পোপদের কুপ্রচারণা

খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে যে, যদি কোনো চোর, দুষ্কৃতি ও পাপীও বাইতুল মুকাদ্দাস দর্শন করে আসে, তাহলে পরকালে সে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যাবে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বড় বড় দুষ্কৃতিকারীও পর্যটক হিসাবে বাইতুল মুকাদ্দাস আসতে শুরু করে। এরা শহরে প্রবেশের সময় নাচ-গান ও শোরগোল করত এবং প্রকাশ্যে শরাব পান করত। তাদের এসব অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও অশোভনীয় আচরণের কারণে তাদের প্রতি কিছু নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু এসব পর্যটক দেশে ফিরে মুসলমানদের কঠোর ব্যবহারের মনগড়া কাহিনী লোকদের শোনাতে থাকে, যাতে তাদের ধর্মীয় উত্তেজনা চাঙ্গা করা যায়।

ঙ. পোপের লিপ্সা

খ্রিষ্টানজাতি তখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একভাগের সম্পর্ক ছিল পশ্চিম ইউরোপের গির্জার সাথে। তাদের কেন্দ্র ছিল রোম। আর দ্বিতীয় ভাগের সম্পর্ক ছিল কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল বা বর্তমানের ইস্তাম্বুলের সাথে। দুই গির্জার অনুসারীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ছিল। পশ্চিম ইউরোপ বা রোমের পোপের কামনা ছিল, পূর্ব ইউরোপ বা বাইজেন্টাইন গির্জার কর্তৃত্বও যদি পাওয়া যেত, তাহলে পুরো বিশ্বের খ্রিষ্টান জাতির আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তার হাতে চলে আসত। সে অনুসারে ইসলামের বিরোধিতা ছাড়াও তার নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সে ঘোষণা করল, সারা দুনিয়ার খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এই যুদ্ধে যে মারা যাবে, সে জান্নাতের অধিকারী হবে, তার সব পাপ মুছে যাবে এবং বিজয়ের পর যেসব ধন-দৌলত পাওয়া যাবে, তা তাদের জীবতদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। পোপের এ ঘোষণার ফলে সারা পৃথিবীর খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

---

৪৩. মূলত, ইসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি এসে দাজ্জালকে খতম করবেন। আর তার এ আগমন খ্রিষ্টানদের জন্য নয়; বরং মুসলিমদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে। এ সংক্রান্ত অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপের গির্জার প্রধান ছিল পোপ দ্বিতীয় আরবান। সে ছিল অত্যন্ত সম্মানপূজারি ও যুদ্ধবাজ ধর্মীয় নেতা। ইউরোপের শাসকদের কাছে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তাই সে নিজের মর্যাদা আবার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়াতে শুরু করে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনা ও মুসলমানদের পরাজিত করার প্রচারণা চালাতে থাকে। গির্জার প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য সে খ্রিষ্টান বিশ্বে ধর্মীয় যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই উত্তম উপায় মনে করল। আর এভাবেই সে ক্রুসেড যুদ্ধের পথ তৈরি করে দিল।

চ. রাজনৈতিক কারণ

বাইজেন্টাইন শাসক মাইকেল ডোকাস ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে তুর্কিদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায়। সারা খ্রিষ্টান বিশ্ব তার আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয় এবং ময়দানে নেমে আসে। এভাবে অল্পদিনের মধ্যে খ্রিষ্টানদের বিশাল এক বাহিনী মুসলমানদের দিকে স্রোতের বেগে ধেয়ে আসে। নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে প্রাচ্যের বাইজেন্টাইন গির্জা ও পাশ্চাত্যের গির্জার মধ্যে পরস্পর সমঝোতা হয়ে যায় এবং উভয় গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশ নেয়।

এদিকে ইসলামি বিশ্বে ছিল ঐক্যের অভাব। বাগদাদের আব্বাসি খিলাফত, মিসরের ফাতিমি খিলাফত, সেলজুকি সালতানাত ও স্পেনের শাসন—সবাই পরস্পর বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো পরিস্থিতি ছিল না। সুতরাং ক্রুসেডারদের জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী হতে পারত?

ছ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ

মুসলমান সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বিরাজমান ছিল, ইউরোপের খ্রিষ্টান সমাজ তখনও তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ক্ষমতাসীন ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এসব মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্য নিজেদের পরিবর্তে মুসলমানদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। নৈতিক অধঃপতনের কারণে জনসাধারণের অবস্থাও ছিল শোচনীয়।

ইউরোপের সরকারব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা ছিল মৌলিক বিষয়। অভাবী ও দরিদ্র লোকেরা বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ ছিল। ইউরোপের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্রের ওপর। সামন্ত প্রভুরা দরিদ্র জনসাধারণের রক্ত চুষে নিত; অথচ তাদের কোনো অধিকার পরিশোধ করত না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রথার অনিষ্টতা ও কুপ্রভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অর্থের সমস্ত উৎস মহাজন, গির্জার যাজক ও জমিদারদের আয়ত্তে ছিল। জনসাধারণ ছিল দুর্দশার মধ্যে। কৃষকদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। তাই ধর্মীয়শ্রেণি ধর্মের আচরণে জনগণের প্রতিক্রিয়া রোধ করার চেষ্টা চালায়, যাতে তাদের মনোযোগ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলির দিকে না যায়। তা ছাড়া উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যারা বঞ্চিত হয়েছিল, তারাও নিছক অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের স্বার্থে এতে বাতাস দেয়।

ইতালির বাসিন্দারা চাইছিল ফিলিস্তিন ও সিরিয়া দখল করে আগের মতো নিজেদের ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন করতে। কেননা, ইসলামি বিজয়ের কারণে ইতালির ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য তাদের ধারণা ছিল ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে যদি ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার এলাকাসমূহ মুসলমানদের হাত থেকে আবার ছিনিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি ও দুর্দশা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর জন্য বাইরের সমস্যাবলি সম্মুখে নিয়ে আসে। ধর্মীয় নেতারা তাদের বিলাসী জীবন লুকানোর উদ্দেশ্যে জনগণের মনোযোগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক এসব অনাচার থেকে সরিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনার দিকে ফিরিয়ে দেয়।

জ. তাৎক্ষণিক কারণ

তাৎক্ষণিক কারণ ছিল পোপ দ্বিতীয় আরবানের ধর্মযুদ্ধের ফতোয়া। ফ্রান্সের পিটার যখন বাইতুল মুকাদ্দাস জিয়ারতে গেল, তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব তার মনে প্রবল আঘাত সৃষ্টি করল। ইউরোপে ফিরে গিয়ে সে খ্রিষ্টানদের দুরবস্থার মিথ্যাকাহিনী বর্ণনা করল এবং এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সে গোটা ইউরোপ সফর করল। পিটারের এ সফর সেখানকার লোকদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। কিন্তু এই ধর্মযাজক বাইতুল মুকাদ্দাস দর্শন করতে আসা খ্রিষ্টান লোকদের বিশৃঙ্খলা ও দুষ্কর্ম বেমালুম চেপে গেল। পোপ যেহেতু পশ্চিমা গির্জার আধ্যাত্মিক নেতা ছিল, এ জন্য সে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর একটি সম্মেলন ডাকল এবং সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করল। সাথে এ মর্মে সুসংবাদ ঘোষণা করল যে, এ যুদ্ধে মারা গেলে সব ধরনের পাপ মোচন হয়ে যাবে এবং বেহেশতের অধিকারী হওয়া যাবে। লোকেরা দলে দলে সেন্ট পিটারের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে হামলা করার জন্য রওয়ানা হলো।

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ (১০৯৭-১১৪৫ খ্রি.)

পোপ কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর একে একে চারটি বিশাল বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়।

প্রথম বাহিনী : পাদরি পিটারের অধীনে ১৩ লাখ খ্রিষ্টানের এক বিশাল বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। পথে তারা নিজ ধর্মের লোক খ্রিষ্টানদের ওপরই হত্যা, রাহাজানি ও লুটপাট চালিয়ে বুলগেরিয়া হয়ে যখন কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে, তখন এখানকার রোমান সম্রাট তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে তাদের গতি এশিয়া মাইনরের দিকে ফিরিয়ে দেয়। তারা যখন ইসলামি এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সেলজুকি শাসক কালাজ আরসালান এ বাহিনীটিকে নাজেহাল করে ছাড়ে। তাদের প্রচুর সৈন্য মারা পড়ে। ক্রুসেডারদের এ অভিযান একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বাহিনী : এ বাহিনী একজন জার্মান পাদরি গাউসফেলের নেতৃত্বে যাত্রা আরম্ভ করে। তারা যখন হাঙ্গেরি অতিক্রম করছিল, তখন তাদের অনাচারে হাঙ্গেরির লোকেরা নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং তাদের সেখান থেকে বের করে দেয়। এ বাহিনীটিও এভাবে অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে।

তৃতীয় বাহিনী : ক্রুসেডারদের তৃতীয় বাহিনীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ফিনল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল। এ বাহিনী যখন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়, তখন এই স্বেচ্ছাসেবকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শিকার হয় রাইন নদীর তীরবর্তী মুসেলসহ কয়েকটি শহরের ইহুদি বাসিন্দারা। এরা যখন হাঙ্গেরি অতিক্রম করতে থকে, তখন হাঙ্গেরির বাসিন্দারা তাদের কচুকাটা করে হাঙ্গেরির মাটিতে দাফন করে দেয়।

চতুর্থ বাহিনী : সবচেয়ে সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল দশ লাখ সৈন্যের চতুর্থ বাহিনীটি। ১০৯৭ সালে তারা যাত্রা শুরু করে। এ বাহিনীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও সিসিলির রাজপুত্ররা ছিল। ফ্রান্সের গডফ্রের হাতে ছিল এ সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব। বিশাল এই বহিনী এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হয় এবং প্রসিদ্ধ কুনিয়া শহর অবরোধ করে। কালাজ আরসালান পরাজিত হলেন। বিজয়ী খ্রিষ্টানরা অগ্রসর হতে হতে ইন্তাকিয়া পৌঁছে যায়। নয় মাস পর ইন্তাকিয়াও তাদের দখলে চলে যায়। সেখানকার সমস্ত মুসলমানকে তারা হত্যা করে। মুসলমানদের ওপর ক্রুসেডারদের নির্যাতন ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক অধ্যায়গুলোর একটি। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ কেউই তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারল না। প্রায় এক লাখ মুসলমান নিহত হয়। ইন্তাকিয়ার পর বিজয়ী বাহিনী সিরিয়ার কয়েকটি শহর দখল করতে করতে হিমস পৌঁছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস পতন : হিমস দখল করার পর ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। ফাতিমিরা বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার জন্য সন্তোষজনক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এ জন্য ১৫ জুন ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টান উন্মাদরা খুব সহজেই বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। তারা শহরের পবিত্রতার কোনো খেয়াল-ই করেনি। মুসলমানদের ওপর চালানো হয় গণহত্যা ও লুটপাট। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও এই লজ্জাজনক অত্যাচারের কাহিনী স্বীকার করেছে। বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশের এলাকা দখলের পর গডফ্রেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক বানানো হয় এবং বিজিত এলাকাগুলো খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এসব এলাকার মধ্যে ছিল ত্রিপোলি, ইন্তাকিয়া ও সিরিয়ার অংশসমূহ। মুসলমানদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের পরস্পরের অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা।

সেলজুকিদের বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি জিনকি শাসনের গোড়াপত্তন করেন এবং মুসলমানদের নবজীবনে ফিরিয়ে আনেন। তিনি হারবান, হালাব ইত্যাদি এলাকা জয় করে নিজের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ক্রুসেডারদের প্রতিহত করেন এবং তাদের পরাজিত করেন, তা ইসলামের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় হয়ে রয়েছে। ইমাদুদ্দিন রহ. ইথারব দুর্গ ও মিসরের সীমান্ত এলাকা থেকে খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করেন। সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে তিনি সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেন। ইমাদুদ্দিন রহ.-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বালবাক্কে পুনরায় মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ (১১৪৪-১১৮৭ খ্রি.)

ইমাদুদ্দিন রহ.-এর ইনতিকালের পর ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তার যোগ্যপুত্র নুরুদ্দিন জিনকি রহ. পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তিনি পিতার চেয়ে কম তৎপর ছিলেন না। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেন এবং খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে প্রচুর এলাকা ছিনিয়ে নেন। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি ক্রুসেডারদের পরাজিত করতে থাকেন। তার নেতৃত্বে রাওহা শহরটি পুনরায় মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

ক্রুসেডারদের পরাজয়ের খবর সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে পোপ তৃতীয় কনরাড ও ফ্রান্সের শাসক সপ্তম লুইয়ের নেতৃত্বে নয় লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবারও লড়াইয়ের জন্য ইউরোপ থেকে রওয়ানা হয়। এই বাহিনীতে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম ক্রুসেডের মতো এ বাহিনীর সৈন্যরাও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। সপ্তম লুইয়ের বাহিনীর একটি বড় অংশ সেলজুকিদের হাতে ধ্বংস হয়। তারা যখন ইনতাকিয়ায় পৌঁছে, তখন তাদের তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে দামেশক অবরোধ করে। কিন্তু সাইফুদ্দিন জিনকি রহ. ও নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর সম্মিলিত বাহিনীর প্রচেষ্টায় ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। সপ্তম লুই ও কনরাডকে আবার ইউরোপের সীমান্তের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

মিসরে নুরুদ্দিন জিনকির দখল প্রতিষ্ঠা : ইতিমধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয় এবং ইসলামের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যার অসাধারণ কৃতিত্ব ও অবদান আজও মুসলমানদের জন্য ভোলার নয়। এ মহান ব্যক্তি ছিলেন গাজি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.। মিসরের ফাতিমি খলিফা ফাইজ বিল্লাহর এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি খ্রিষ্টানদের স্রোত প্রতিহত করবেন। তার মন্ত্রী শাদির সাদি ক্রুসেডারদের বিপদ অনুভব করে নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-কে মিসরে হামলার আহ্বান জানালেন। নুরুদ্দিন জিনকি রহ. নিজ ভাই আসাদুদ্দিন শিরকোহকে এ অভিযানে নিযুক্ত করলেন। সে মতে আসাদুদ্দিন মিশরে প্রবেশ করে খ্রিষ্টানদের নাস্তানাবুদ করলেন। কিন্তু শাদির বিশ্বাসঘাতকতা করে শিরকোহের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সাথে আঁতাত করল। ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে শিরকোহ আবার মিসরে হামলা চালালেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া দখলের পর মিসরের অধিকাংশ এলাকা আয়ত্ত করে নিলেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. এসব অভিযানে শিরকোহের সহযোগী ছিলেন। শাদির সাদিকে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এবং শিরকোহ হন খলিফা আজিদের মন্ত্রী। তারপর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. তার স্থলাভিষিক্ত হন। খলিফা তাকে আল মালিকুন নাসির উপাধি দেন। খলিফা আজিদের ইনতিকালের পর মিসরের স্বাধীন সুলতান হওয়ার পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিজ জীবনের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেন।

হিত্তিন যুদ্ধ : মিসর ছাড়াও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিরিয়া, মুসেল, আলেপ্পো ইত্যাদি এলাকা জয় করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময়ে ক্রুসেডার নেতা রিজনাল্ডের সাথে চার বছরের শান্তিচুক্তি হয়। সে মতে উভয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু এ চুক্তি কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ক্রুসেডাররা যথারীতি বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে এবং মুসলমানদের কাফেলার ওপর হামলা অব্যাহত রাখে।

১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রিজনাল্ড এ ধৃষ্টতা দেখায় যে, সে আরও কয়েকজন খ্রিষ্টান নেতাকে সাথে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হামলার উদ্দেশ্যে হিজাজে অভিযান চালায়। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. তার তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য পদক্ষেপ নেন এবং অবিলম্বে রিজনাল্ডকে ধাওয়া করতে করতে তাকে হিত্তিন গিয়ে ধরে ফেলেন। সুলতান সেখানে শত্রুবাহিনীর ওপর এমন এক আগ্নেয় উপাদান নিক্ষেপ করেন, যাতে মাটিতে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগ্নেয় পরিবেশে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তিনে সংঘটিত হয় ইতিহাসের ভয়াবহতম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ত্রিশ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয় এবং একই পরিমাণে বন্দী হয়। রিজনাল্ড নিজেও বন্দী হয়। সুলতান নিজ হাতে তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করেন। এ যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী খ্রিষ্টানদের এলাকাসমূহে প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়ে সব দখল করে ফেলে।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় : হিত্তিনে জয় লাভের পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মনোযোগ দেন। এক সপ্তাহ ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খ্রিষ্টানরা আত্মসমর্পণ করে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে। দীর্ঘ ৯১ বছর খ্রিষ্টানদের হাতে থাকার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয় ছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু তিনি বিজিত জাতির সাথে ক্রুসেডারদের মতো আচরণ করলেন না। তিনি খ্রিষ্টানদের

ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার নির্যাতন করেননি; বরং চল্লিশ দিনের মধ্যে তাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। দয়ালু সুলতান মুক্তিপণ হিসাবে নির্ধারণ করলেন মামুলি অর্থ। তাও যারা পরিশোধ করতে অপারগ হলো, তাদের তিনি এমনিতেই মুক্তি দিলেন। কারও কারও মুক্তিপণ তিনি নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দিলেন। তখন থেকে প্রায় ৭৬১ বছর পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদেরই আয়ত্তে ছিল। তারপর ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসের অর্ধেক চলে যায় ইহুদিদের দখলে। এরপর ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের পুরো দখল নিয়ে নেয় ইসরাইল, যা আজ পর্যন্ত তাদের দখলে রয়েছে।

তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯২ খ্রি.)

বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়া ক্রুসেডারদের জন্য মৃত্যুর পয়গামের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। মুসলমানদের এ বিজয়ের খবরে সারা ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের আয়োজন শুরু হয়। পুরো ইউরোপ এতে যোগ দেয়। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারব্রোসা, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড সবাই এ যুদ্ধে অংশ নেয়। পাদরি ও ধর্মযাজকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের উত্তেজিত করতে থাকে।

খ্রিষ্টান বিশ্ব এত বিশাল সেনাবাহিনী আগে কখনো তৈরি করেনি। অসংখ্য সৈন্যের এ বাহিনী রওয়ানা হয়ে আক্কা বন্দর অবরোধ করে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. একাকী আক্কা বন্দর রক্ষার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডারদের কাছে ইউরোপ থেকে লাগাতার সাহায্য আসতে থাকে। এক যুদ্ধে দশ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তবুও ক্রুসেডাররা অবরোধ বহাল রাখে। যেহেতু অন্য কোনো ইসলামি রাষ্ট্র থেকে সুলতানের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ানো হলো না, এ জন্য ক্রুসেডারদের অবরোধে শহরবাসীর সাথে সুলতানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সুলতান সব রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানদের কোনো সাহায্য পৌঁছাতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে শহরবাসীরা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে শহরটি খ্রিষ্টানদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে মতে মুসলমানরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দুলাখ স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধে সম্মত হয় এবং মহাক্রুস ও পাঁচশ খ্রিষ্টান বন্দীকে ফেরত দেওয়ার শর্ত মেনে নিয়ে মুসলমানরা অস্ত্র ফেলে দেয়। মুসলমানদের সব সহায় সম্পদ নিয়ে শহর থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু রিচার্ড বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অবরুদ্ধ লোকদের হত্যা করে।

আক্কার পর ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিনের আসকালান বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। আসকালান যাওয়ার পথে সুলতানের বাহিনীর সাথে খ্রিষ্টানদের বারোটি লড়াই হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরসুভের লড়াই। সুলতান বীরত্ব ও সাহসিকতার উজ্জ্বল নমুনা পেশ করেন। কিন্তু যেহেতু কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে বাগদাদের খলিফার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য আসেনি, এ জন্য সুলতানকে শেষ পর্যন্ত পিছপা হতে হলো। ফিরে আসার সময় সুলতান নিজেই আসকালান শহর ধ্বংস করে দিলেন। ক্রুসেডাররা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ইটের স্তূপ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। এরই মধ্যে সুলতান বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার সব আয়োজন সম্পন্ন করলেন। কেননা, এবার ক্রুসেডারদের টার্গেট ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। সুলতান তার ছোট একটি বাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টানদের বিশাল বাহিনীকে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করতে লাগলেন। বিজয়ের কোনো আশা দেখতে না পেয়ে ক্রুসেডাররা সন্ধির আবেদন জানালে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাতে সাড়া দেন। আর এরই মাধ্যমে তৃতীয় ক্রুসেড শেষ হয়।

চুক্তির শর্তগুলো ছিল এরূপ :

১. বাইতুল মুকাদ্দাস যথারীতি মুসলমানদের হাতে থাকবে।

২. আরসুভ, হায়ফা, ইরাফা ও আক্কা ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়।

৩. আসকালান স্বাধীন এলাকা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

৪. পর্যটকদের আসা-যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

এ ক্রুসেডে খ্রিষ্টানরা আক্কা বন্দর ও দু'তিনটি এলাকা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারেনি। তারা বিফল হয়ে ফিরে যায়। রিচার্ড শেরদিল সুলতানের বদন্যতা, উদারতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়। জার্মান সম্রাট পালিয়ে যাওয়ার সময় নদীতে ডুবে মারা যায় এবং এ যুদ্ধে সব মিলিয়ে প্রায় ছয় লাখ খ্রিষ্টান সৈন্য প্রাণ হারায়।

চতুর্থ ক্রুসেড (১২০১-১২০৪ খ্রি.)

চতুর্থ ক্রুসেড মূলত সাজানো হয়েছিল মিশরে হামলা চালিয়ে জেরুজালেম জয় করার উদ্দেশ্যে ।আইয়ুবি সুলতান আল-মালিকুল আদিলের হাতে খ্রিষ্টানরা দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় বরণ করে এবং ইয়াফা শহর মুসলমানদের আয়ত্তে চলে আসে। পরিবর্তে এপ্রিল ১২০৪ সালে ক্রুসেডাররা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে লাভজনক ও অমার্জিত লুণ্ঠন বলে মনে করা করা হয়।

পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৭-১২২১ খ্রি.)

পঞ্চম ক্রুসেড ছিল ইউরোপের খ্রিস্টানদের জেরুসালেম ও পবিত্র ভূমি পুনর্দখলের একটি প্রচেষ্টা, যাতে প্রথমে মিশরের শক্তিশালী আইয়ুবি রাজ্যকে পরাজিত করার চেষ্টা করা হয়।

ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২২৮ খ্রি.)

ষষ্ঠ ক্রুসেড ১২২৮ সালে জেরুজালেম পুনরায় অধিকারের উদ্দেশ্যে শুরু হয়। পঞ্চম ক্রুসেডের ব্যর্থতার মাত্র সাত বছর পরে এটি শুরু হয়েছিল। পোপ এনভিসেন্টের নেতৃত্বে আড়াই লাখ জার্মান সৈন্যের বিশাল বাহিনী সিরিয়ার উপকূল আক্রমণ করে। আইয়ুবি শাসক আল-আদল নীলনদের মোহনায় প্রতিরোধ গড়ে তুললে খ্রিষ্টান বাহিনী নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

সপ্তম ক্রুসেড (১২৪৮-১২৫৪ খ্রি.)

আল-মালিকুল কামিল ও তার ভাইদের মধ্যে বিরোধের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাস শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কামিলের উত্তরসূরি সালিহ তা আবার ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। বাইতুল মুকাদ্দাস যথারীতি মুসলমানদের আয়ত্তে থেকে যায়।

অষ্টম ক্রুসেড (১২৭০-১২৭১)

ফ্রান্সের সম্রাট নবম লুই পরিচালিত একটি ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ, যা ১২৪৮ হতে ১২৫৪ পর্যন্ত সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রাজা নবম লুই পরাজিত ও বন্দী হয়। আইয়ুবি রাজবংশের শাসক মোআজ্জেম তুরানশাহ এর নেতৃত্বে মিশরীয় বাহিনী রাজা নবম লুইকে বন্দী করে। যুদ্ধ শেষে লুইয়ের মুক্তির জন্য ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (ফ্রান্সের তখনকার বাৎসরিক আয়ের সমান অর্থ) মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া হয়। এই ক্রুসেডে মিশরীয় বাহিনীকে বাহরি, মামলুক, বাইবার, কুতুজ, আইবাক ও কুলওয়ান গোষ্ঠী সহায়তা করে।

নবম ক্রুসেড (১২৭১-১২৭২ খ্রি.)

নবম ক্রুসেডকে অনেক সময় অষ্টম ক্রুসেডের সাথে একত্রে বর্ণনা করা হয়। এটিকে পবিত্র ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে সংঘটিত শেষ ক্রুসেড হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি ১২৭১-১২৭২ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের নবম লুই অষ্টম ক্রুসেডের সময় তিউনিস দখলে ব্যর্থ হলে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইসরাইলের আকো বন্দরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু ততদিনে ইউরোপের ক্রুসেডের জোয়ার ছিল শেষের দিকে। আর মিশরের মামলুক রাজবংশও ছিল বেশ শক্তিশালী। মুসলমানরা ইংরেজ ও ফরাসি যৌথবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। ফলে এডওয়ার্ডের এই ক্রুসেড ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পরপরই ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ক্রুসেডারদের বাকি ঘাটিগুলিরও একে একে পতন ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে ক্রুসেডারদের অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্রুসেডারদের মধ্যে নতুনভাবে আর যুদ্ধের সাহস রইল না। এদিকে মুসলমানরা নিজেদের এলাকা রক্ষায় সচেতন হয়ে যায়।

নিজেদের দীর্ঘ যুদ্ধের ধারা শেষ হয় এবং খ্রিষ্টানরা ধ্বংস ও পরাজয় ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে না পারায় তাদের যুদ্ধের উন্মাদনা থিতিয়ে যায়। একপর্যায়ে ধারাবাহিক ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের অবসান ঘটে।

অন্যান্য ক্রুসেড

এখানে যে নয়টি ক্রুসেডের বিবরণ দেওয়া হলো, এগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছে। সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে বালকদের ক্রুসেড নামে এক বিশেষ যুদ্ধের আয়োজন করা হয়। খ্রিষ্টান পাদরিদের মতে বয়স্ক মানুষেরা পাপী হয়ে থাকে। পাপীরা থাকার কারণে ক্রুসেড বাহিনী জয় লাভ করতে পারছে না। যেহেতু বালকেরা নিষ্পাপ হয়, অতএব যদি তাদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হয়, তাহলে বিজয় আসতে পারে। সে মতে সাঁইত্রিশ হাজার বালকের এক বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়। ফ্রান্স থেকে ত্রিশ হাজার বালকের বাহিনী রওয়ানা হয় সেনাপতি স্টিফেনের নেতৃত্বে। আর জার্মান থেকে নিকোলসের নেতৃত্বে রওয়ানা হয় সাত হাজার বালক। কিন্তু এসব বালকের কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছাতে পারেনি; বরং ফ্রান্সের উপকূলীয় এলাকা ও ইতালিতে তাদের সবাইকে গোলাম বানিয়ে নেওয়া হয় এবং তারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তারা নিঃশেষ হয়ে যায়। বালকদের এ ক্রুসেড সংঘটিত হয় পঞ্চম ক্রুসেডের আগে। ইউরোপে উসমানি খিলাফতের সম্প্রসারণ ঠেকানোর জন্য চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেসব যুদ্ধ হয়, ইউরোপীয়রা সেগুলোকেও ক্রুসেড নাম দেয়।

১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উসমানিরা বেলগ্রেড অবরোধ করলে তা ভাঙার জন্য ইউরোপীয়রা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তখন উসমানি সুলতান ছিলেন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ রহ.। তিনি বেলগ্রেড জয় করতে সক্ষম হলেন না। এতে ক্রুসেডাররাই বিজয়ী হলো। অবশ্য অনেক পরে ১৫২১-এর ২৯ আগস্ট সুলতান প্রথম সুলাইমান রহ. বেলগ্রেড জয় করে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফলাফল

দুই শতাব্দী ধরে চলতে থাকা যে ক্রুসেডযুদ্ধ মুসলমানদের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে ধ্বংস ও নাশকতা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারেনি ইউরোপীয়রা। এভাবে এই ধর্মীয় উন্মাদনার ফলে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রথমত, এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। এসব যুদ্ধ ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেওয়ার জন্য, কিন্তু যথারীতি তা মুসলমানদের দখলেই থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে বৈরিতার মজবুত দেয়াল তৈরি হয়ে যায়। আর তা আজ পর্যন্ত বহাল আছে। এ দুধর্মের মানুষের মধ্যে স্থায়ী বিরোধের পেছনে রয়েছে এসব যুদ্ধ। বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার নামে গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পশ্চিমা ও মার্কিন পরিকল্পনা সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

তৃতীয়ত, ইউরোপে যখন যুদ্ধের উন্মাদনা থেমে যায়, তখন তারা গির্জাগুলোর প্রভাব ও কর্তৃত্ব অনুধাবন করতে পারে। ফলে গির্জার কর্তৃত্বের সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, যাতে প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে গির্জার প্রভাব কমে যায়।

চতুর্থত, ইউরোপের অসভ্য লোকেরা যখন মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে, তখন মুসলমানদের শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি দেখে অভিভূত হয়ে যায়। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের কারণে তাদের মানসিকতায় বিপ্লব সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইউরোপের পরিবেশ অনুকূল হয়ে যায়। তা ছাড়া ইউরোপে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটে এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

পঞ্চমত, ইউরোপে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেনের পরিবর্তে মুদ্রাব্যবস্থা চালু হয়। তা ছাড়া শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রেও ইউরোপে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ইউরোপের স্থাপত্য শিল্পও ইসলামি স্থাপত্য রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।[৪৪]

দশম ক্রুসেড (১৮৩০-১৯৬০ খ্রি.)

দশম ক্রুসেড শুরু হয়, তুরস্কের উসমানি খিলাফত ধ্বংসের আবর্তনের ঘটনাবলির মাধ্যমে। এ ক্রুসেড উসমানি খিলাফতকে আবর্তন করে হলেও এর সূচনা আরও আগ থেকেই হয়েছিল। যেমন ব্রিটিশ-ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ কর্তৃক উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা।

৪৪. খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে ক্রুসেড উসকে ওঠার কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ থেকে ফলাফল বর্ণনা পর্যন্ত বাংলা, উরদু, আরবি উইকিপিডিয়া থেকে সংগহীত।

চরম উপনিবেশকৃত উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ :

মিশর : ১৮৮২ থেকে এটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। ১৯১৪ সালে তা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ অবিভাবকত্বের অধীনে ১৯২২ থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ১৯৩৬ থেকে তার পরবর্তী বছরগুলোতে স্বায়ত্তশাসন। সর্বশেষ ব্রিটিশ বাহিনী সুয়েজ খাল এলাকা থেকে ১৯৫৬ সালে চলে গেলে মিশর স্বাধীনতা লাভ করে।

সুদান : ১৮৯৯ থেকে ব্রিটিশদের অধীনে মিশর-সুদান দুই সার্বভৌম সরকারের যুগ্ম শাসনে পরিচালিত হয়। এরপর ১৯৫৬-এর পর এসে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

তিউনিসিয়া : ১৮৮১ থেকে ফ্রান্সের উপনিবেশ বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

আলজেরিয়া : ফ্রান্স কর্তৃক বশীকরণ শুরু হয় ১৮৩০ সালে। এরপর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

মরক্কো : ১৯১২ সালে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এরপর ১৯৫৬ সালে স্বাধীন হয়।

লিবিয়া : ১৯১১ থেকে ইটালীয় উপনিবেশ চলে আসছে। যখন ইটালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যায়, তখন তাদের লিবিয়াও হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৫১ সালে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৬৯ সালে রাজতন্ত্রও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাধারণ উপনিবেশকৃত দেশসমূহ

এ সকল দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত উসমানি খিলাফতের অধীনে ছিল। সাইকস-পিকটের চুক্তিটি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। এমন দেশের সংখ্যা পাঁচটি। যথা :

সিরিয়া : ফ্রান্স কর্তৃক ১৯১৮ সালে উপনিবেশকৃত এলাকা ছিল। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

ইরাক : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৩২ সালের পর নামমাত্র স্বাধীনতা পায়।

জর্দান : ১৯১৮ সালে ব্রিটিশদের ম্যান্ডেড[৪৫] বা অধিকৃত ভূমি হিসাবে ছিল। অতঃপর ১৯৪৬ সালে তাদের উপনিবেশ উঠে যায়।

ফিলিস্তিন : ১৯১৮ সালে ব্রিটিশদের ম্যান্ডেড বা অধিকৃত ভূমি ছিল। ১৯৪৮-১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত।

লেবানন : ১৯১৮ সালে ফ্রান্সের ম্যান্ডেড বা অধিকৃত ভূমি ছিল। অতঃপর ১৯৪৩ সালে জাতীয় চুক্তির সাথে উপনিবেশ উঠে যায়।

উল্লেখ্য যে, ১৯১৮ সালের পূর্বে জর্দান, ফিলিস্তিন ও লেবানন দেশ তিনটি সিরিয়ার অংশ ছিল।

উপসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রসমূহ :

১৮৩০ সালের পর থেকে ব্রিটিশ সেনা ও নেভালের অধীনে থাকা কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত অঞ্চলগুলো ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্বে আসে। সৌদি আরব ১৯৩০-এর দশকে অস্তিত্বে আসে। কুয়েত ১৯৫০-এর দশকে ইরাকি-ব্রিটিশ অভিভাবকত্ব থেকে বের হতে সক্ষম হয়। তেল আবিষ্কারের পূর্বে এ সকল অঞ্চল উপনিবেশকারীদের কাছে অর্থগত কোনো চাহিদাপ্রাপ্ত ছিল না।[৪৬]

---

৪৫. বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরাজিতদের কাছ থেকে নেওয়া অঞ্চল।

৪৬.http://coldwarstudies.com/2013/01/11/history-of-colonization-in-the-middle-east-and-north-africa-mena-precursor-to-cold-war-conflict/

আরব উপদ্বীপের দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহ

দক্ষিণ ও উত্তর ইয়ামান : সমুদ্রপথে একটি ব্রিটিশ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ চুরি হয়ে যাওয়ার অজুহাতে ব্রিটিশরা ১৮৩৯ সালে এডেন দখল করে। ১৯৩৭ সালে এ অঞ্চল ব্রিটিশ রাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এডেন ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসাবে শাসিত হয়ে আসছিল। ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ ইয়ামান স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৯০ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশ দুটি আলাদা রাষ্ট্র উত্তর ইয়ামান এবং দক্ষিণ ইয়ামান নামে বিভক্ত ছিল। উভয় দেশ একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ইয়ামান গণপ্রজাতন্ত্রী এবং দক্ষিণ ইয়ামান কমিউনিস্ট শাসনাধীনে ছিল।[৪৭]

চলমান ক্রুসেড

এখনও অবিরতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকা তাদের মনের গভীরে লুকায়িত হিংসা ও ঘৃণা থেকে উত্তেজিত হয়। যা তাদের অতীত সে পরাজয়গুলোর ফল, তাদের খ্রিষ্টীয় গোঁড়ামি ও চরমপন্থা থেকে যার উৎপত্তি। যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা উসকে দেয়, যার ফলে তারা হিংসায় ফেটে পড়ে। ফলে যখনই তারা সুযোগ পায় মুসলিমদের নির্যাতন ও অত্যাচার করতে থাকে।

আমাদের অতীত ও বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের হাতে মুসলিমদের ওপর যে নজীরবিহীন নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়েছে, স্পেনে যে গণহত্যা ও রক্তের বন্যা প্রবাহিত করা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের ওপর যে জুলম চলছে; নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতার ষোলকলায় পূর্ণ এ ভয়ংকর চিত্র বলিষ্ঠ যুবককেও শীর্ণকায় বৃদ্ধে পরিণত করে। এ চিত্র দেখে দুর্বল মনের অধিকারীরও প্রাণঘাতী হৃদরোগে আক্রান্ত হতে বেশি দেরি হয় না, যার আরেকটি চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের মাঝে।

মুসলমানদের ওপর জুলম-নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা, দীর্ঘকাল থেকে ইসলামের ভূমিগুলোতে তাদের উপনিবেশ, মুসলিমদের দেশে মুসলিমদের ওপর চলা ষড়যন্ত্র, ইসলামের ভূমি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাজনক সাইকস-পিকট, বেলফো, ১৫ মে ১৯৪৮-এর বাণিজ্যিক চুক্তি ইত্যাদির মতো হাজারো অপরাধ ও ষড়যন্ত্রে ভরা ক্রুসেডের ইতিহাস। ক্রুসেডের এ ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা অতিদীর্ঘ, তাদের চরমপন্থার ফিরিস্তি বর্ণনাতীত।

২০০১ সালে আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার হামলাকে বুশ ক্রুসেড হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আমেরিকার জনগণ ব্যাপকহারে এ যুদ্ধকে সমর্থন জানায়। বর্তমানেও এ যুদ্ধে চলছে। এ ছাড়া ইরাক হামলা, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে হামলা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি আমেরিকা তার ক্রুসেডের জাল সারা বিশ্বেই বিছিয়ে রেখেছে।

কাফিরদের সাথে মুসলিমদের আচরণনীতি

চরমপন্থা ও গোঁড়ামিপূর্ণ এ ক্রুসেড খ্রিষ্টানদের এমন ঘৃণ্য করে তোলে যে, নিপীড়ন-অত্যাচারের সময় তারা সামান্য পরিমাণও দ্বিধাবোধ করে না, তাদের মনে একটুও দয়া বা মানবিক অনুভূতি জাগরুক হয় না। ইসলাম মুসলিমদের আদেশ দেয় এ ধরা থেকে শিরক ও জুলুম নিশ্চিহ্ন করার। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হলো এ ধরা থেকে কুফর-শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং ক্রুসেডের মতো প্রভৃতি জুলুম ও চরমপন্থা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

> 'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা জালিম তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।[৪৮]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

৪৭. https ://bn.wikipedia.org/wiki/ইয়েমেন#আধুনিক ইতিহাস
৪৮. সুরা আল-বাকারা : ১৯৩

‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করেন।’[৪৯]

এমনিভাবে ইসলাম মুসলিমদের শিক্ষা দেয় দয়া-পরবশ হওয়ার, কল্যাণার্থে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার। ইসলামে মুসলিম ও অমুসলিম সবার ওপর জুলুম করাকে হারাম করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় কল্যাণের চিন্তা করতে ও কল্যাণের কাজ করতে আদেশ দিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতে বলেছে; যদিও তা কোনো ইহুদি, খ্রিষ্টানের পক্ষে বা কোনো নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যাক না কেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো; এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত।’[৫০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

‘হে মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। কেউ যদি সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের ব্যাপারে অধিক কল্যাণকামী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কেই অবগত।’[৫১]

৪৯. সুরা আল-আনফাল : ৩৯
৫০. সুরা আল-মায়িদা : ৮
৫১. সুরা আন-নিসা : ১৩৫

অনুশীলনী

১. পূজনবাদ কী? জাতীয়তাবাদের ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করো।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা কী? ধর্মনিরপেক্ষতার রূপসমূহ আলোচনা করো।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো উল্লেখ করো।

৪. পুঁজিবাদের প্রকৃত রূপ কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।

৫. সংক্ষেপে পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্র ও এর ফলাফল আলোচনা করো।

৬. কমিউনিজম কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।

৭. কমিউনিজমপ্রীতির কারণসমূহ কী কী?

৮. কমিউনিজমের চারটি মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৯. সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী?

১০. ক. গণতন্ত্রের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

খ. শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের স্বরূপ আলোচনা করো।

১১. (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

১২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার করা হয়, এর বিশদ আলোচনা করো।

১৩. ইসলাম ও গণতন্ত্রের কতিপয় পার্থক্য আলোচনা করো।

১৪. ক্রুসেড কী? একে কেন ক্রুসেড নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১৫. একাদশ শতকে ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ কী?

১৬. বিশ্বে চলমান ক্রুসেডের বাস্তবতা উল্লেখ করো।